বৌদ্ধকোষ

[Encyclopaedia of Buddhism]

প্রথম খণ্ড

পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮৫-৮৬

বৌদ্ধকোষ

[Encyclopaedia of Buddhism]

প্রথম খণ্ড

পালি বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮৫-৮৬

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদকীয় নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের মধ্যে প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী। মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত প্রভৃতি বৌদ্ধদর্শনে সুনিষ্ণাত আচার্যগণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহা বুধজননন্দিত ও কালজয়ী এবং তাহাতে এই বিভাগের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি বিশেষ গৌরব দাবী করিতে পারে। পালি বিভাগটী ছাত্রসংখ্যার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য না হইলেও, এই বিভাগের অধ্যাপকগণের নিরন্তর গবেষণা খ্যাতি অর্জন করিয়াছে—ইহা অস্বীকার করা যায় না। কোন একটি বিভাগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় সেই বিভাগীয় অধ্যাপক ও ছাত্রদের গবেষণা ও শাস্ত্রচর্চার মাধ্যমে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বিভাগের উন্নতির প্রতি উদাসীন নহেন। তাঁহাদেরই আনুকূল্যে আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় যে বৌদ্ধকোষ প্রকাশিত হইল তাহা সীমিত অর্থের কারণে ক্ষুদ্রাকার হইলেও কোষ-জগতে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান বলিয়া বিনম্রভাবে দাবী করিবার অধিকার রাখে। বাংলা ভাষায় ভারতকোষ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও উচ্চকোটিক গবেষণা ও তথ্যসমৃদ্ধ এই বৌদ্ধকোষ বিভাগীয় সম্মিলিত গবেষণার প্রথম প্রয়াস রূপে পরিগণিত। এই প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ ভাবে স্মরণ করি অধ্যাপকপ্রবর ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার একটি অবদানকে। তিনি বৌদ্ধগ্রন্থকোষ নামক একখানি সঙ্কলনাত্মক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাংলায় বৌদ্ধকোষ গ্রন্থের পথিকৃৎরূপে পূজ্য। (বৌদ্ধকোষ-প্রথম খণ্ড ; বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষ-প্রথম ভাগ ; পিটকগ্রন্থাবলী ; কলিকাতা, ১৯৩৬)।

যে পরিমাণ অর্থ ও সময় এইরূপ গ্রন্থের জন্য নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন, নানা প্রকার জটিলতায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া আমরা প্রথমেই নিবেদন করিতেছি। সংস্কৃতের তুলনায় পালি ভাষায় গবেষণা জটিলতর, কারণ, পালি সাহিত্যের গ্রন্থগুলির অনেক অনুবাদ ও পুনরনুবাদ প্রভৃতি হইয়াছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল তিব্বতীয়, চীনদেশীয় ও সিংহলীয় ভাষা। অনেক বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বর্তমান জগতে পালি ভাষায় গবেষণাত্মক রচনায় প্রবৃত্ত হইলে গবেষকের পালি ব্যতীত অন্ততঃ সংস্কৃত, তিব্বতী ভাষা, চীনা ভাষা প্রভৃতিতে পারদর্শিতা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় এবং ইহা বস্তুতঃ সময়সাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যের সীমা আর্থিক বৎসরের অলঙ্ঘ্য বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত। তাহা ছাড়া নিবন্ধ লেখককে উদার ভাবে অকৃপণ হস্তে কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই, কারণ, পত্রসংখ্যা সীমিত। এই সমস্ত বিধিনিষেধের মধ্যে গবেষকদের কাজ করিতে হইয়াছে বলিয়া নিবন্ধগত দৈন্য থাকিলে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এমন কি অকপটে স্বীকার করা হইতেছে যে পরিকল্পিত পৃষ্ঠার স্বল্পতার জন্য কয়েকটি মূল্যবান্ নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। একই কারণে গ্রন্থপঞ্জীকে বিস্তৃতভাবে সুসমৃদ্ধ করিয়া সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা এই খণ্ডে হইল না। তবে প্রায় প্রতিটী প্রবন্ধে সেই সেই বিশেষ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও অবদান সম্পর্কে যথাযথভাবে সংকেত দান করা হইয়াছে। ইহাকে অনেকেই এই গ্রন্থের অপূর্ণতা বা ত্রুটি বলিলেও এই দৈন্য পরিবেশ ও পরিকল্পনার বশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। বিশিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সাংকেতিক চিহ্নের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং পরিকল্পনা অনুসারে সম্পূর্ণরূপে ও বিস্তৃতভাবে শেষ খণ্ডে ইহার সংযোজন হইবে।

শ্রীলঙ্কা সরকারের পরিকল্পনায় প্রখ্যাত পালি পণ্ডিত স্বর্গতঃ জি, পি, মলালশেকের কর্তৃক সম্পাদিত *Encyclopaedia of Buddhism* নামে যে কয়েক খণ্ড কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পৃথিবীর প্রথিতযশা পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ তাহাদের শাশ্বত অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থকে মোটামুটী আদর্শ হিসাবে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অধ্যাপক মলালশেকের রচিত *Dictionary of Pali Proper Names* (দুইটি খণ্ড, ১ম খণ্ড, লণ্ডন, ১৯৩৭ ; ২য় খণ্ড, লণ্ডন, ১৯৩৮) আমাদের বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে বলিয়া পালি ভাষার প্রবাদপুরুষ এই অধ্যাপকের অবদানের প্রতি অকপটে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপকগণ সম্মিলিত ভাবে এই প্রথম প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রমাদাদি, অসঙ্গতি বা অসম্পূর্তি স্বাভাবিক ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত পরিলক্ষিত হইবে। পালি ভাষায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ যদি কোন প্রকার ভ্রম, প্রমাদ বা দৈন্যের প্রতি সদয়ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহা হইলে পরবর্তী খণ্ডে তাহা সংশোধিত করিবার চেষ্টা করিব।

ভগবান তথাগতের অভয়প্রদ চরণকমলদ্বয়ে শরণ গ্রহণ করিয়া পরিশেষে বিনম্র নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি—

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বুদ্ধপূর্ণিমা
১৯৮৬

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে,
শ্রীকানাইলাল হাজরা
শ্রীআশা দাশ

প্রবন্ধ-সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
অক্ষরনীতি	১
অক্ষোভ্য	১-২
অগ্‌গঞ্‌ঞসুত্ত	২
অগ্‌গবংস	২
অগ্‌গিকভারদ্বাজ	২-৩
অগ্‌গিক্খন্ধোপমসুত্ত	৩
অগ্‌গিবচ্ছসুত্ত	৩-৪
অঙ্গিরস	৪-৫
অঙ্গুত্তরনিকায়	৫-৭
অঙ্গুলিমাল	৭
অচলা	৮
অচিরবতী	৮-৯
অচ্চুতবিক্কন্ত	৯
অচ্ছরিয় অব্‌ভুত-ধম্মসুত্ত	৯-১০
অজন্তা	১১-১৪
অজপালনিগ্রোধ	১৪
অজাতশত্রু	১৫-১৬
অজিতকেসকম্বলী	১৬
অঞ্জনবন	১৭
অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞপচ্চয়	১৭
অঞ্‌ঞাতকোণ্ডঞ্‌ঞ	১৭-১৮
অট্‌ঠকনাগরসুত্ত	১৮
অট্‌ঠবিমোক্খ	১৮-১৯
অট্‌ঠিকসুত্ত	১৯
অড্‌ঢকাসী	১৯-২০
অতীশ	২০-২১
অত্তদণ্ডসুত্ত	২২
অত্থপটিসম্ভিদা	২২-২৩
অত্থসালিনী	২৩-২৪
অত্থিপচ্চয়	২৪
অধিকরণসমথা ধম্মা	২৫
অধিচিত্ত	২৫-২৬
অধিচ্চসমুপ্পন্নবাদ	২৬
অধিপঞ্‌ঞা	২৬
অধিপতিপচ্চয়	২৬-২৭
অধিসীল	২৭
অনগারিক	২৭
অনঙ্গনসুত্ত	২৭
অনত্তা	২৮-২৯
অনন্তরপচ্চয়	২৯-৩০
অনাগতবংস	৩০
অনাগামী	৩০-৩১
অনাথপিণ্ডিক	৩১
অনাথপিণ্ডিকোবাদসুত্ত	৩১-৩২
অনিচ্চ	৩২
অনিয়তা ধম্মা	৩২-৩৩
অনুপাদসুত্ত	৩৩
অনুপিয়	৩৩
অনুমানসুত্ত	৩৩-৩৪
অনুরাধপুর	৩৪-৩৫
অনুরুদ্ধ	৩৫-৩৬
অনুসয়	৩৭
অনুস্সতি	৩৭
অনোপমা	৩৭-৩৮
অনোমদস্সী	৩৮
অনোমা	৩৮
অন্তরাভব	৩৯-৪০
অন্তানন্তিক	৪০
অন্ধকবিন্দ	৪০
অন্ধবন	৪০
অপদান	৪০-৪১
অপণ্ণকসুত্ত	৪১
অপরগোযান	৪১-৪২
অপরসেল	৪২-৪৩
অপ্পনা	৪৩
অপ্পমাদ	৪৩-৪৪
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ	৪৪-৪৫
অব্ভোকাসিকঙ্গ	৪৫
অভয়গিরি	৪৫-৪৬
অভয়রাজকুমার	৪৬

	পৃষ্ঠা
অভয়া	৪৬-৪৭
অভয়াকরগুপ্ত	৪৭-৪৮
অভিঞ্‌ঞা	৪৮-৪৯
অভিজ্‌ঝা	৪৯
অভিধম্মত্থসঙ্‌গহ	৪৯-৫২
অভিধম্মাবতার	৫২-৫৪
অভিধম্মপিটক	৫৪-৫৭
অভিধর্মকোশ	৫৭-৫৯
অভিধর্মমহাবিভাষা	৬০-৬১
অভিধর্মবিজ্ঞানকায়পাদ	৬১
অভিধর্মবিভাষাশাস্ত্র	৬১
অভিধর্মসমুচ্চয়	৬২-৬৩
অভিধর্মসার	৬৩
অভিধানপ্পদীপিকা	৬৩
অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র	৬৩-৬৪
অভিরূপা নন্দা	৬৪
অভিসময়ালংকারকারিকা	৬৫-৬৬
অমরপুরনিকায়	৬৬-৬৭
অমরাবতী	৬৭-৬৯
অমরাবিক্খেপিকা	৬৯-৭০
অমিতাভ	৭০-৭১
অমোঘবজ্র	৭১-৭২

	পৃষ্ঠা
অমোঘসিদ্ধি	৭২
অম্বপালী	৭২-৭৩
অম্বলট্‌ঠিকা	৭৩-৭৪
অরঞ্‌ঞবাসিনিকায়	৭৪
অরিমদ্দন	৭৪
অরিয়পরিয়েসনসুত্ত	৭৫
অরিয়পুগ্‌গল	৭৫-৭৬
অরিয়বংস	৭৬
অরিয়বংসসুত্ত	৭৬
অরূপলোক	৭৬-৭৭
অরূপাবচর	৭৭
অর্থপদসূত্র	৭৭-৭৮
অর্থবিনিশ্চয়সূত্র	৭৮-৭৯
অর্হৎ	৮০
অল্লকপ্প	৮০
অলগদ্দোপমসুত্ত	৮১
অবতংসকসূত্র	৮১-৮২
অবদানশতক	৮২-৮৩
অবলোকিতেশ্বর	৮৩-৮৫
অবিগতপচ্চয়	৮৫
অবিজ্জা	৮৫
অবিজ্ঞপ্তি	৮৬-৮৭

অক্ষয়মতি

সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের অবলোকিত-পরিবর্তে 'অক্ষয়মতি' এই সংজ্ঞার অর্থ হল অপরিমিতবুদ্ধি, অর্থাৎ যিনি তার অপরিমেয় অষ্টবিধ জ্ঞান অপর ব্যক্তিকে দান করতে সমর্থ। আবার অন্য অর্থ হল—যিনি জীবের দুঃখমোচনের জন্য অপরিমিত ইচ্ছা পোষণ করেন। এজন্যই তিনি চীন ও তিব্বতে প্রচলিত **অক্ষয়মতি-নির্দেশ (নাম মহাযান) সূত্রের** রচয়িতা হিসাবে পরিচিত। তিনি ষোড়শ ভদ্রকল্প বোধিসত্ত্বের অন্যতম। অভয়াকরগুপ্তের **নিষ্পন্নযোগাবলী** (GOS; CIX) গ্রন্থানুসারে তিনরকম ভাবে তাঁর বিবরণ দান করা হয়েছে। যেমন—'অক্ষয়মতিঃ সুবর্ণবর্ণো বামমুষ্টিং হৃদাবস্থাপ্য সব্যেন বরদমুদ্রঃ'। (পৃঃ ৫০)।

আবার, 'অক্ষয়মতিঃ পীতঃ সব্যেন খড়্গং, বামেনাভয়কমলং বিভর্তি' (ঐ, পৃঃ ৫৮)।

আবার বলা হয়েছে, 'অক্ষয়মতিঃ সিতো হস্তাভ্যাং জ্ঞানামৃতকলশধারী'। (ঐ, পৃঃ ৬৭)। চীনদেশে ইনি Wu-chin-i-p'u-sa, বা Wu-chin-hui-p'u-sa, অথবা Wu-Liang-i-p'u-sa নামে খ্যাত। জাপানে তাঁর নাম Mujin-i-bosatsu, আবার তিব্বতে তিনি Blo-gros-mi-zad-pa নামে পরিচিত।

তাঁর গুহ্য নাম Ting-hui-chin-kang (সং—অচলপ্রজ্ঞাবজ্র) এবং বীজমন্ত্র হল 'বি' (পৃঃ 4832b. Mochizuki, S : Bukkyō dia-jiten, 1-8, Tokyo, 1933-57)

সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্রের (ed. U. Wogihara and K. Tsuchida, Tokyo, 1934-35) বিবরণ অনুসারে রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে ভগবান্ তথাগত ধর্মপর্যায় সম্পর্কে বোধিসত্ত্ববিষয়ক যে দেশনা দান করেন (সর্ববুদ্ধপরিগ্রহ) অক্ষয়মতি সেই জনসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন (পৃঃ ১-৪)।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর Tendai পুরোহিত Singaku বিরচিত *Gojūkwanso*-র মতে অক্ষয়মতি হলেন আটজন বোধিসত্ত্বের অন্যতম যিনি ভক্ত উপাসকদের **অমিতাভ** বুদ্ধের **সুখাবতী**লোকে গমন করতে সাহায্য করেন। **মহাবৈপুল্যমহাসন্নিপাতসূত্রের** মতে মনে হয় এই বোধিসত্ত্ব **সহলোকধাতু** (এ জগৎ) ও সমন্তভদ্র তথাগতের জগতের মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী মধ্যস্থ। (দ্র. Nanjio, 61, fasc. 27)।

বিশদ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—R. A. Gunatilaka বিরচিত নিবন্ধ, *Encyclopaedia of Buddhism*, Ceylon, 1964, পৃ, ৩৬১-৬২, গ্রন্থে প্রকাশিত।

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অক্ষোভ্য

অক্ষোভ্য শব্দটির অর্থ হল—অকম্পিত বা অবিচলিত। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধমণ্ডলের একজন অক্ষোভ্য। নেপালের বৌদ্ধগণ ধ্যানী বুদ্ধের ক্রম-পর্যায়ে এঁকে দ্বিতীয় স্থানে বসিয়েছেন। মহাযানগ্রন্থ **প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে** (পৃঃ ১৮১, ed. Vaidya) সর্বপ্রথম অক্ষোভ্যের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে **সদ্ধর্মপুণ্ডরীক** (পৃঃ ১১৯), **অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহ ও সুখাবতীব্যূহ** (পৃঃ ৫৮-৫৯) গ্রন্থসমূহে এই ধ্যানী বুদ্ধের উল্লেখ ও বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইনি অভিরতি নামক স্বর্গলোকের অধিবাসী, বিজ্ঞান-স্কন্ধ-স্বভাবের প্রতীক। কোন কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে ইনি ব্রহ্মসত্ত্ব বিশিষ্ট এবং 'বজ্রকুলী'। 'বজ্রধর' বা 'বজ্রপাণি' এর ধ্যানী বোধিসত্ত্ব। **অদ্বয়বজ্র** গ্রন্থের (পৃঃ ৪০-৪১) বর্ণনানুযায়ী সূর্যমণ্ডলের (orb) নীলাক্ষর 'হূং' থেকে এঁর উৎপত্তি। ইনি দ্বি-বাহু এবং এক-মুখাবয়ব বিশিষ্ট। ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বজ্রপর্যঙ্কাসনে আসীন। যুগ্মহস্তী এঁর বাহন। চরণতলে

চক্র-চিহ্ন-সমন্বিত। **নিষ্পন্নযোগাবলী** গ্রন্থে (পৃঃ ৫২) অক্ষোভ্য অষ্টভুজ রূপে বর্ণিত। মুখাবয়বের দক্ষিণদিক শ্বেতবর্ণের ও বাম অংশটি রক্তবর্ণের, দক্ষিণ বা বাম হস্তে ইনি যথাক্রমে বজ্র, পদ্ম, চক্র (discus), ঘণ্টা, চিন্তামণি-রত্ন, খড়্গ ধারণ করেন। অন্য দুটি প্রধান হস্তে *yab-yum* (আলিঙ্গন ভঙ্গী) ভঙ্গীতে শক্তি প্রজ্ঞাকে আলিঙ্গন করেন। মামকী এঁর শক্তি ও প্রজ্ঞা। প্রাচীন সিংহল (শ্রীলংকা), জাভা, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশে ইনি উপরে বর্ণিত রূপেই পূজিত হন। তিব্বত ও চীন দেশে ইনি বেশ জনপ্রিয় দেবতা।

এ-ছাড়া চার বা ছ-হাতের অক্ষোভ্যের চিত্র বা মূর্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধসংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অক্ষোভ্যের মূর্তি ও চিত্র পূজিত হয়।

বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : Alice, Getty, *The Gods of Northern Buddhism*, p. 36

সাধন সরকার

অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্ত

দীঘনিকায়ের অন্তর্গত একটি সুত্ত (সূত্র)।

শ্রাবস্তীর পূর্বারামে বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ নামে দুজন সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণ শিষ্যের নিকট ভগবান্ বুদ্ধ এই সূত্রটি বলেছিলেন। এতে পৃথিবী, মানুষ এবং সমাজের বিবর্তনের কথা বর্ণিত হয়েছে। ধর্মজীবন-যাপনই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভের ভিত্তি। ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী এই যুক্তি ভগবান বুদ্ধ খণ্ডন করেছিলেন।

দ্রষ্টব্য : **দীঘনিকায়**, ৩য়, পৃ. ৮০

বেলা ভট্টাচার্য

অগ্‌গবংস

ইনি পাগানরাজ নরপতি সিথুর (১১৬৭-১২০২ খ্রীঃ) শিক্ষক ছিলেন। অগ্‌গবংস পাগানের এক নির্জন বিহারে বাস করতেন। তিনি ব্রহ্মদেশের পাগান রাজ্যের একজন বিখ্যাত পালি ব্যাকরণের রচয়িতা। ১১৫৪ খৃঃ তিনি **সদ্দনীতি** নামে পালি ব্যাকরণ রচনা সম্পূর্ণ করেন।

[দ্রষ্টব্য : তস্মা তদত্থিকা সুদ্ধং নয়ং নিস্সায় বিঞ্ঞুনং
ভঞ্ঞমানং ময়া সদ্দনীতিং গণ্হথ সাধুকং ॥
সদ্দনীতি, সং Helmer Smith, Lund, 1928, ১ম, পৃ. ১]

এই গ্রন্থ রচনা করে তিনি সিংহলের বৌদ্ধ সংঘের নিকট আশাতিরিক্ত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, এতে ব্রহ্মদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছিল। **গন্ধবংস** গ্রন্থে তাঁকে জম্বুদ্বীপ (ভারত) থেকে আগত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : *PPN*, 1.9.

বেলা ভট্টাচার্য

অগ্‌গিকভারদ্বাজ

ইনি প্রাচীন শ্রাবস্তীর ভারদ্বাজ গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ। একদিন তাঁর গৃহে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছিল। তখন ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষা-নিমিত্ত পরিভ্রমণ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ এই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞাহুতি প্রস্তুত করতে দেখেন। বুদ্ধ তাঁর গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করলে ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে 'মুণ্ডক' ও 'বসলক' (হীনজাতি)

বলে উপহাস করলে ভগবান বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন বসলক কাকে বলে এবং কি কারণে বসলক হয়? ব্রাহ্মণ নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁকে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে বললেন। তখন বুদ্ধ 'বসল সুত্ত' দেশনা করে বললেন যে জন্মের দ্বারা কেহ 'বসল' অথবা ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই হয়। ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট 'সোপাক' জাতীয় চণ্ডাল মাতঙ্গের কাহিনীও বর্ণনা করলেন। মাতঙ্গ চণ্ডাল হয়েও সৎকর্মের দ্বারা সুযশের অধিকারী হয়েছিলেন। কাম ও রাগ ত্যাগ করেছিলেন বলে মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে স্থান পেয়েছিলেন। এ বৃত্তান্ত আমরা **সুত্তনিপাত** ও **সুত্তনিপাত-অট্‌ঠকথা** থেকে পাই। ইনি রাজগৃহের একজন অগ্নি-উপাসক ব্রাহ্মণ। এটা আমরা **সংযুক্তনিকায়** অট্‌ঠকথায় **অগ্‌গিকসুত্তে** পাই। (**সংযুক্তনিকায়**, ১ম, পৃ. ১৬৭-৬৭, **সুত্তনিপাত** পৃ. ২১-২৫)

বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : *PPN*, 1, 11.

বেলা ভট্টাচার্য

অগ্‌গিক্‌খন্ধোপম সুত্ত

পালি **অঙ্গুত্তরনিকায়ের** সত্তক নিপাতের অন্তর্গত মহাবগ্‌গের একটি সূত্র। একসময় ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে বিচরণ করছিলেন। ঐ সময় পথের মধ্যে অগ্নিপ্রজ্বলন দৃশ্য দেখে উপমা দিয়ে ভিক্ষুদের চরিত্রনীতি সম্পর্কে ভগবান বুদ্ধ এই সূত্রটি দেশনা করেছিলেন। এখানে ভগবান বুদ্ধের মূল বক্তব্য হল যে অসচ্চরিত্র হয়ে ভিক্ষুর ছদ্মবেশে শ্রদ্ধাশীল দায়ক থেকে ভিক্ষা গ্রহণের চেয়ে জলন্ত অগ্নিতে শয়ন করা অনেক ভাল। যখন এই সূত্র দেশনা করা হচ্ছিল তখন ষাটজন ভিক্ষু রক্তবমন করেন। ষাটজন সন্ন্যাস ত্যাগ করেন এবং ষাটজন অর্হত্ত্ব লাভ করেন। এই সময় বহু ভিক্ষু সংঘ ত্যাগ করে পুনরায় গৃহীজীবন যাপন করেন, ফলে সংঘের অবস্থা খুব খারাপ হয়। সংঘ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ছিল। এই সূত্রের প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য **চূলচ্ছরাসংঘাত সুত্ত** দেশনা করা হয়েছিল। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র পরবর্তীকালে এই সূত্রটি সিংহলে প্রচার করেছিলেন। যোনক ধর্মরক্ষিত অপরান্ত দেশে এই সূত্র দেশনা করেছিলেন।

বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : *PPN*, 1, 11 ; **অঙ্গুত্তরনিকায়**, ৪র্থ, পৃ. ১২৮।

বেলা ভট্টাচার্য

অগ্‌গিবচ্ছসুত্ত

পালি **মজ্‌ঝিমনিকায়ের** প্রথম খণ্ডের পরিব্রাজক-বগ্‌গের একটি সূত্র। এটিকে **অগ্‌গিবচ্ছগোত্ত** সুত্ত বলা হয়। এই সুত্তটির এরকম নামকরণ করা হয় কারণ ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজকের কাছে অগ্নির উপমা দিয়ে এই সূত্রটি বলেছিলেন। এই সূত্রে বুদ্ধদেব পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে কাল্পনিক মতবাদ প্রকাশের অসারতা ব্যাখ্যা করেছেন। বচ্ছগোত্তের কাছে এইরকম আরও সূত্র বলেছিলেন। এই সূত্র থেকে ভগবান বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। বচ্ছগোত্ত একদিন ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে কুশল বিনিময় করে বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। ভগবান বুদ্ধ তার উত্তরে বলেন যে, তিনি দশটি অকথনীয় (অব্যাকৃত) মত পরিণামে দুঃখময় জেনে গ্রহণ করেন না, যথা :—

(১) লোক (জগৎ) শাশ্বত এটাই সত্য, অন্য সব মিথ্যে ; (২) লোক অশাশ্বত...মিথ্যে ; (৩) লোক অন্তবান্...মিথ্যে ; (৪) লোক অনন্তবান্...মিথ্যে (৫) যেটি জীব (life principle) সেটিই শরীর...মিথ্যে, (৬) জীব এক, শরীর অন্য...মিথ্যে, (৭) তথাগত

মৃত্যুর পর থাকে…মিথ্যে, (৮) তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না…মিথ্যে (৯) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও, নাও থাকে…মিথ্যে, (১০) তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না… মিথ্যে।

বচ্ছগোত্ত ভিক্ষু মোগ্‌গল্লান ও বুদ্ধকে পূর্বেও এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বুদ্ধের মতে এই রকম মতবাদের প্রত্যেকটি দৃষ্টিগত (মতমাত্র), দৃষ্টি গ্রহণ (দুর্গম), দৃষ্টিকান্তার, এটা ভয়ংকর দুঃখময়, আঘাতময়। এগুলি দ্বারা নির্বাণলাভ বা সম্বোধিলাভ হয় না। তখন বচ্ছগোত্ত ভাবলেন তাহলে ভগবান বুদ্ধ কি অন্য কোন মতবাদ স্বীকার করেন? না, তিনি পঞ্চস্কন্ধের অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের অস্তিত্ব, উৎপত্তি ও বিনাশ জানেন। সেজন্য তিনি সবরকম মননের, অহংকারের ক্ষয় ও নীরোগ হেতু উপাদান রহিত হয়ে বিমুক্ত। বচ্ছগোত্ত এর উত্তরে প্রশ্ন করলেন, এরকম বিমুক্ত ভিক্ষু কোথা থেকে আসেন? ভগবান বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন যে বিমুক্ত ভিক্ষু উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয়, নাও হয় এবং উৎপন্ন হয় না, নাও হয় না একথা বলা চলে না। এই সমস্ত শুনে বচ্ছগোত্ত বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বুদ্ধের কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তখন বুদ্ধ বুঝলেন যে বচ্ছগোত্তের অজ্ঞানের সম্ভাবনা আছে। কারণ বুদ্ধের প্রত্যাশাকার (কার্যকারণ) ধর্ম গভীর, দুর্দশ্য দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত (উত্তম), তর্কাতীত, নিপুণ (সূক্ষ্ম) এবং পণ্ডিতবেদনীয়, সেজন্য বচ্ছগোত্তের মত অন্যমতাবলম্বী ভিন্নরুচিসম্পন্ন অন্য আচার্যের পক্ষে বুদ্ধের ধর্ম জানা খুবই কঠিন কর্ম। যেমন আমরা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে, অগ্নি নির্বাপিত করলে জানা যায় না যে অগ্নি কোথায় অন্তর্হিত হল। ঠিক এইভাবে পঞ্চস্কন্ধের দ্বারা বিজ্ঞাপিত তথাগত যখন ক্ষীণাস্রব হয়ে ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির স্বভাব প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার প্রতি উপযুক্ত চতুষ্কোটি প্রযোজ্য নয়।

তাঁর বক্তব্য আরও পরিস্ফুট করার জন্য বুদ্ধ বলেন যে, অগ্নি প্রজ্বলিত করলে সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু নির্বাপিত হলে কোথায় যে অন্তর্হিত হয় সেটা কেউই বলতে পারে না। বচ্ছগোত্ত বুদ্ধের এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করে সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দ্রষ্টব্য: **মজ্‌ঝিমনিকায়**, ১ম, পৃঃ, ৪৮০।

বেলা ভট্টাচার্য

অঙ্গিরস

(১) পালি **সুত্তপিটকে** ভগবান বুদ্ধকে অনেক জায়গায় অঙ্গিরস নামে অভিহিত করা (**দীঘনিকায়**, ৩য়, পৃ. ১৯৬; **সংযুক্ত নিকায়**, ১ম, পৃ. ১৯৬; **অঙ্গুত্তর নিকায়**, ৩য়, পৃ. ২৩৯) হয়েছে। বিভিন্ন টীকাকার এই কথাটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। বুদ্ধঘোষের মতে, অঙ্গিরস শব্দের অর্থ দেহ থেকে বিভিন্ন বর্ণের জ্যোতির বিচ্ছুরণ। ধর্মপালের ব্যাখ্যানুযায়ী এই কথাটি পুণ্য প্রভৃতি নানা গুণের আধারকে বোঝায়। তাঁর মতে ভগবান বুদ্ধের ক্ষেত্রেই এই নামটি প্রযোজ্য। বুদ্ধদেবের পিতা তাঁকে সিদ্ধার্থ ও অঙ্গিরস এই দুটো নাম দিয়েছিলেন। গৌতমগণ সাধারণতঃ অঙ্গিরস গোত্রভুক্ত বলে পরিচিত।

(২) ইনি একজন বৈদিক ঋষি। তিনি অনেক বৈদিক সূক্তের রচয়িতা। **নিকায়ে** উল্লিখিত অন্যান্য ঋষি হচ্ছেন—অট্ঠক, বামক, বামদেব, বেস্সমিত্ত, যমতগ্‌গি, ভারদ্বাজ, বাসেট্ঠ, কস্সপ, এবং ভৃগু। তাঁরা উন্নত চরিত্রের ছিলেন এবং তাঁদের কোনও লোভ ছিল না।

(৩) ব্রাহ্মণগণ দাবি করেন যে, তাঁরা ব্রহ্মার আটজন মানসপুত্র অর্থাৎ আটজন ঋষির বংশধর। এই আটজন হলেন ভৃগু, অঙ্গিরস, মরীচি, অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু।

ভৃগু, অঙ্গিরস ও বশিষ্ঠের বংশধরগণ ছিলেন সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ পরিবার। অঙ্গিরস ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার আত্মশুক্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে অগ্নিভৃগু এবং অঙ্গার থেকে অঙ্গিরার উদ্ভব হয়। ঋগ্বেদীয় ঋষিদের মধ্যে অঙ্গিরা অন্যতম হলেও অঙ্গিরসগণের কৃতকর্ম এবং খ্যাতি প্রধানতঃ অথর্ববেদের মন্ত্রসংকলনের নিমিত্তই।

(৪) বিষ্ণুর পরশুরাম অবতারে ইনি একজন প্রধান শত্রু।

(৫) মহাব্যুৎপত্তিগ্রন্থে উল্লিখিত একজন রাজা। তিনি এবং চক্রবর্তী রাজা অঙ্গিরস একই ব্যক্তি।

বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ; *PPN*, 1, 20.

বেলা ভট্টাচার্য

অঙ্গুত্তরনিকায়

পালি **সুত্তপিটকের** অন্তর্গত চতুর্থ নিকায় বা সূত্রসংগ্রহের নাম **অঙ্গুত্তরনিকায়**। এই নিকায়ের আনুমানিক মোট ২৩০৮টি সূত্র এগারটি নিপাত বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রত্যেক নিপাত কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। নিপাতগুলিকে উর্দ্ধক্রমসংখ্যায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম নিপাতের নাম একনিপাত এবং শেষ নিপাতের নাম একাদসক (একাদশ) নিপাত। নিপাতের সূত্রগুলি এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যাতে একই নিপাতের সূত্রগুলির আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যার সমতা থাকে। 'একনিপাতে' অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে যাদের প্রত্যেকের সংখ্যা এক। যেমন তথাগত 'একজন' ব্যক্তি যিনি মানবজাতির মঙ্গলসাধন করেন। এই নিপাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সমাহিত চিত্ত, অসমাহিত চিত্ত, নির্বাণলাভের উপায় হিসেবে ধ্যানধারণা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে এবং সারিপুত্ত, মোগ্গল্লান, মহাকস্সপ প্রভৃতি প্রধান বুদ্ধশিষ্যদের কথা বিবৃত হয়েছে। 'দুক নিপাত' অর্থাৎ দুই সংখ্যাযুক্ত নিপাতে আলোচিত হয়েছে দুরকম বুদ্ধ, বনবাসের দুটি কারণ, দুরকমের পাপ যা ইহজন্মে শাস্তিদায়ী এবং পরজন্মে নরকভোগের কারণ, দুরকমের দান—জিনিষদান ও ধর্মদান, দুরকমের বাসনা : লাভ-সৎকারের বাসনা ও দীর্ঘায়ুষ্যের বাসনা, ইত্যাদি ; 'তিকনিপাত' অর্থাৎ তিন সংখ্যাযুক্ত নিপাতের আলোচ্য বিষয় হল তিন প্রকারের পাপকর্ম—কায়িক, বাচিক ও মানসিক ; তিন প্রকারের ভিক্ষু ; দেবতাদের তিন দূত—জরা, ব্যাধি ও মরণ, তিন রকমের তূষ্ণীভাব, নারীদের নরক গমনের তিনটি কারণ, ইত্যাদি। 'চতুক্কনিপাত' অর্থাৎ চার সংখ্যাযুক্ত নিপাতে ধর্মবিনয় থেকে চ্যুতির চারটি কারণ—ব্রহ্মচর্য্য, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির অধিকারী না হওয়া ; পাপসঞ্চয়ের চারটি কারণ, যথা—প্রশংসার অযোগ্যকে প্রশংসা করা, প্রশংসার যোগ্যকে দোষারোপ করা, অনুপযুক্ত স্থানে আমোদ লাভ করা ও যথাস্থানে আনন্দ না করা এবং এর বিপরীত চারটি কারণে পুণ্যসঞ্চয় করা ; চারটি কারণে স্বর্গে গমন ; স্ত্রীলোকের চারটি অবস্থা লাভ, যথা—কুরূপা ও দরিদ্র, সুরূপা কিন্তু দরিদ্র, সুরূপা অথচ ধনী এবং কুরূপা ও ধনী হওয়া ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। 'পঞ্চকনিপাত' অর্থাৎ পাঁচ সংখ্যাযুক্ত নিপাতের আলোচ্য বিষয় হল শৈক্ষ্যের নির্বাণলাভের জন্য পাঁচটি বল (শক্তি), যথা—শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য (অপরাধ থেকে নিবৃত্তি), বীর্য ও প্রজ্ঞা ; তথাগতের পূর্বোক্ত পাঁচটি বল, শরীরের পাঁচটি উপক্লেশ (মালিন্য) ; পাঁচ নীবরণ (উচ্চ অধ্যাত্ম জীবনে বাধা), যথা—কামচ্ছন্দ (লোভ ও কাম), ব্যাপাদ (হিংসা), স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-জড়তা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা (সন্দেহ বা দ্বিধাভাব) ; পাঁচটি ধ্যানের বিষয়—যথা—অশুভ, অনিত্যতা, মরণ, আহারে বিরূপতা ও সর্বলোকে অনভিরতি, ইত্যাদি।

'ছক্কনিপাত' অর্থাৎ ছয় সংখ্যাযুক্ত নিপাতের আলোচ্য বিষয় হল ভিক্ষুর ছটি **পালনীয় ধর্ম**, যথা—কর্মে আমোদলাভ না করা (ন কম্মারামতা), ভাষণে বা বিতর্কে আমোদলাভ না করা (ন ভস্সারামতা), নিদ্রামগ্ন না থাকা (ন নিদ্দারামতা ; সহবাস না করা (ন সঙ্গণিকারামতা), ভদ্রতা (সোবচস্সতা) ও কল্যাণমিত্রতা ; ছয়টি উচ্চতম বিষয়, যথা—তথাগত-দর্শন, তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন, তথাগতের উপদেশ শ্রবণ, তথাগত প্রচারিত ধর্মে শিক্ষালাভ, তথাগত ও তদীয় শিষ্যদের সেবা করা এবং তাদের অনুস্মৃতি, ইত্যাদি। 'সত্তকনিপাত' অর্থাৎ সাত সংখ্যাযুক্ত নিপাতে শ্রদ্ধা, শীল ইত্যাদি সাত প্রকার ধন, সাত প্রকার বন্ধন, সাত প্রকার ধ্যানের উপাচার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। 'অট্‌ঠকনিপাত' অর্থাৎ আট সংখ্যাযুক্ত নিপাতের আলোচ্য বিষয় হল স্বামীস্ত্রীর আট প্রকার বন্ধন, আট প্রকার দান, ভূমিকম্পের আটটি কারণ। দেবলোকে পুনর্জন্মের জন্য স্ত্রীলোকের আটটি গুণের অধিকারী হওয়া, ইত্যাদি। নবক (নয়) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হল নয় প্রকার ব্যক্তি, যথা—অর্হত্ব, অর্হত্ব লাভেচ্ছু, অনাগামী, অনাগামী ফলেচ্ছু, সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফলেচ্ছু, স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি ফলেচ্ছু ও পৃথগ্‌জন ; অশুভ, মরণ, ইত্যাদি নয় প্রকার সংজ্ঞা বা চিন্তার বিষয়; রাগ-দ্বেষ-মোহ ইত্যাদি নয় প্রকার মালিন্য দূর করে অর্হত্বলাভ ইত্যাদি। দসক (দশ) নিপাতের আলোচ্য বিষয় হল বুদ্ধের দশপ্রকার বল, দশপারিশুদ্ধি, ধর্মের দশ মূলতত্ত্ব, ইত্যাদি এবং একাদসক নিপাতে নির্বাণলাভের জন্য প্রয়োজনীয় এগারটি গুণ যা কোন ব্যক্তিকে দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে ; নির্বাণে পৌঁছবার এগারটি পথ, আসব জ্ঞান লাভের জন্য এগারটি গুরুধর্ম ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে।

দীঘনিকায় ও মজ্‌ঝিমনিকায়ের—বৃহদাকার সূত্রগুলিতে বুদ্ধের ধর্মের যে সমস্ত মূলতত্ত্ব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাই **সংযুত্তনিকায়ের** মত **অঙ্গুত্তরনিকায়েও** ক্ষুদ্রাকার সূত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত হয়েছে এবং অন্যান্য নিকায়ের মত এখানেও গদ্যাংশের মধ্যে গাথার অনুপ্রবেশ হয়েছে। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের অবতারণা এই নিকায়ে দেখা যায়। অন্য নিকায়ের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও **অঙ্গুত্তরনিকায়ের** স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বর্তমান। এ সম্পর্কে ডঃ বিমলাচরণ লাহা বলেছেন, "The distinction of the Aṅguttara lies in the fact that its bearing is on the whole, practical, we mean on the aspect of discipline and the time may come when it will be satisfactorily proved that the origin of the materials of the Vinaya Suttavibhaṅga were derived mainly from this Nikāya. Its importance lies also in the fact that of the contents of the Puggalapaññatti which is one of the earliest of the Abhidhamma books, are nothing but excerpts from it" (*History of Pali Literature*, pt. I, পৃঃ, 191-192)। **অঙ্গুত্তরনিকায়ে** উল্লিখিত বিবিধ শাস্তিবিধান সেকালের দণ্ডবিধির ওপর আলোকপাত করে। এই নিকায় থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাই। মনে হয় অঙ্গুত্তরনিকায় এমন এক সময়ে সংকলিত হয়েছিল যখন বুদ্ধকে একজন সর্বজ্ঞ ও সত্যের উৎস বলে মনে করা হত এবং ভক্তদের নিকট বুদ্ধ প্রায় দেবতারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, সম্রাট অশোক তার শিলালিপিতে বলেছেন—বুদ্ধ যা বলেছেন সবই সু-উক্তি, আর অঙ্গুত্তরনিকায়ে (৪র্থ পৃঃ ১৬৪) উল্লিখিত হয়েছে : যং কিঞ্চি সুভাসিতং সব্বং তং তস্স ভগবতো বচনং অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

সর্বাস্তিবাদী সংস্কৃত পিটকের একোত্তরাগম পালি অঙ্গুত্তরনিকায়ের অনুরূপ বিভাগ হলেও

এদুটির মধ্যে সাদৃশ্য খুব কম। পালি **অঙ্গুত্তরনিকায়ের** রোমান সংস্করণ ও ইংরাজী অনুবাদ Pali Text Society, London কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : M. Winternitz, *History of Indian Literature*, vol. II, পৃঃ, ৬০, ২৩৪ ; D. K. Barua, *An Analytical Study of the Four Nikāyas*, পৃঃ, ৫৭৫-৫৬৯

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অঙ্গুলিমাল

মজ্ঝিমনিকায়ে এবং অবদানশতকে এ'র নাম পাই। অঙ্গুলিমাল একজন কুখ্যাত দস্যু ছিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন। তাঁর পিতা কোশল রাজ্যের পুরোহিত ছিলেন। পিতার নাম গগ্‌গ এবং মাতার নাম মন্তানী। চোর-নক্ষত্র যোগে অঙ্গুলিমালের জন্ম হয়।

অঙ্গুলিমালের জন্মের সময় শ্রাবস্তীতে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রজ্বলিত হয়েছিল। শিশুর নাম রাখা হয়েছিল অহিংসক কারণ এতে কারো কোনোও ক্ষতি হবে না।

অহিংসক বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেধাবী শিষ্য হওয়ায় আচার্যের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। নিজের সতীর্থদের প্ররোচনায় আচার্য তাঁকে ধ্বংস করার জন্য গুরুদক্ষিণা স্বরূপ মানুষের দক্ষিণহস্তের সহস্র অঙ্গুলি আনতে বললেন। সেজন্য অহিংসক কোশলের জালিনী বনে আগত পথিকদের হত্যা করে তাদের অঙ্গুলি কেটে কণ্ঠে মালা রূপে ধারণ করতেন। অঙ্গুলি কর্তন করে মালা ধারণ করতেন বলে তার নাম অঙ্গুলিমাল। একবার কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অঙ্গুলিমালকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন বলে স্থির করলেন। অঙ্গুলিমালের মাতা পুত্রকে সাবধান করার জন্য জালিনী বনে যাত্রা করলেন। এই সময় অঙ্গুলিমালের একটিমাত্র অঙ্গুলির প্রয়োজন ছিল। মাতাকে আসতে দেখে পুত্র তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ ধ্যানবলে সব জানতে পেরে মাতৃহত্যা থেকে অঙ্গুলিমালকে নিবৃত্ত করার জন্য গগনমার্গে গমন করে অঙ্গুলিমালের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন কিন্তু অক্ষম ও বিমূঢ় হয়ে রইলেন। অঙ্গুলিমালের দস্যুতায় সমস্ত গ্রাম ও নগরে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল, পরে তা জনমানবশূন্য হয়। ভগবান বুদ্ধকে দেখে অঙ্গুলিমালের পরিবর্তন হয়। ভগবান বুদ্ধের প্রভাবে অঙ্গুলিমাল ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করে ব্রহ্মচর্য-জীবনযাপন করতে লাগলেন। একদা অঙ্গুলিমাল ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় রাজা প্রসেনজিৎ তাঁকে ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অঙ্গুলিমাল কিছুই গ্রহণ করলেন না। একদিন শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্যার জন্য বহির্গমন করলে তাঁকে দস্যু বলে এক জনতা আক্রমণ করে এবং আঘাত করে। রক্তাপ্লুতাবস্থায় ভগবান বুদ্ধের কাছে গেলে ভগবান বুদ্ধ তার কৃতকর্মের ফল বলে ব্যাখ্যা করেন। কথিত আছে তিনি সত্যক্রিয়ার দ্বারা এক গর্ভবতী রমণীর প্রসববেদনার লাঘব করেছিলেন। রমণীকে যন্ত্রণায় কাতর দেখে সত্যক্রিয়া করলেন যে—ভিক্ষু হয়ে তিনি প্রাণিহত্যা করেননি। এই সত্যক্রিয়ার দ্বারা রমণী ও তার গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল হোক। ফলে রমণী নিশ্চিন্তে সন্তান প্রসব করেন। এই সত্যক্রিয়া 'অঙ্গুলিমাল পরিত্ত' বা পরিত্রাণকারী মন্ত্র বলে খ্যাত। অঙ্গুলিমাল অর্হত্ত্বলাভ করেছিলেন (**মজ্‌ঝিমনিকায়**, ২য়, ১০৩-৪ : *PPN*-I. 23)

বেলা ভট্টাচার্য

(১) অচলা

বোধিসত্ত্বের ক্রমিক ধর্মবিষয়ক বিবর্তনের যে পর্যায়কে ভূমি আখ্যা দেওয়া হয় সেই বোধিসত্ত্বভূমির অষ্টম ভূমিকে **অচলা** বলা হয়। তিব্বতীয় ভাষায় এর সংজ্ঞা হল *mi-gyo-ba* এবং চীনাভাষায় *pu-tung*। **দশভূমিকসূত্রে** এই ভূমিকে আর প্রত্যাবর্তন হবে না বলে বলা হয় 'অবিবর্ত্য', কষ্টসাধ্য বলে 'দুরাসাদ', রাজকুমারগণ কর্তৃক লভ্য বলে—'কুমার'; আবার আরও বলা হয় 'পরিনিষ্পন্ন', 'পরিনিষ্ঠিত'; 'নির্মাণ', 'নির্বাণ', 'অধিষ্ঠান' ও 'অনাভোগ'। এই ভূমিতে পৌঁছাতে গেলে আটটি ধাপ (পরিকর্ম) উত্তীর্ণ হতে হয়। তারা হল—'সর্বসত্ত্বচিত্তজ্ঞান', 'অভিজ্ঞাক্রীড়ন', 'বুদ্ধক্ষেত্রনিষ্পত্তি', 'বুদ্ধসেবা', 'দিব্যচক্ষু-যোনিষ্পত্তি', 'জিনক্ষেত্রপরিশুদ্ধি',' মায়োপমাবস্থান' ও 'সংচিন্ত্যভববাদানা' (দ্রষ্টব্য, *Prajñā-pāramitās*, I, *G.O.S*, LXII, পৃঃ ৯৯)। এ ভূমিতে উপনীত বোধিসত্ত্ব সর্বাতিক্রমী জ্ঞান বা 'অভিজ্ঞা' লাভ করেন ও ধর্মকায় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হন এবং সংক্ষেপে বলা চলে যে পারমার্থিকরূপে কোন পদার্থেরই যে উৎপত্তি নাই (**অনুৎপত্তিকধর্মক্ষান্তি**) সেই জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি দশটী বলে (**বশিতা**) বলী হয়ে সর্বভূতানুকম্পী রূপে বিরাজমান হন। (বিশেষভাবে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Har Dayal, *The Bodhisattva Doctrine*, VI.) **দশভূমিকসূত্রের** 'অচলা' 'অনাভোগ-নির্নিমিত্ত-বিহারের' অনুরূপ। **মহাযান-সূত্রালঙ্কারে** এই ভূমিকে অচলা বলা হয়েছে কারণ বোধি-সত্ত্ব এই অবস্থাতে কারণ কারণাভাবের ভাব দ্বারা বিচলিত হন না (দ্বয়সংজ্ঞাবিচলনাদচলা চ নিরুচ্যতে দ্বাভ্যাং সংজ্ঞাভ্যামবিচলনাৎ—নিমিত্তসংজ্ঞয়া অনিমিত্তসংজ্ঞয়া চ)। আরও বলা হয়েছে—'নিমিত্তাভোগ অকম্প্যত্বাদচলা ভূমিঃ' (Obermiller কর্তৃক—'*The Doctrine of Prajñāpāramitā*'' নিবন্ধে উল্লিখিত, *Acta Orientalia*, XI. পৃ. ৫৬ দ্রষ্টব্য)। **মহাবস্তু** গ্রন্থে এই ভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে 'জন্মনিদেশ' রূপে (১.৭৬.১৭)। ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে এই ভূমি বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

অচলা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য:
Encyclopaedia of Buddhism এ লিখিত Rajapatiranaর নিবন্ধ (পৃঃ ১৫৩-৪)।

(২) অচলা-

সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে (পৃ, 400) উল্লিখিত তথ্যানুসারে ধর্মপ্রচারকদের রক্ষার জন্য পুত্রসন্তান, আত্মীয়স্বজন সহ যে এগার জন রাক্ষসী তথাগতের সামনে উপস্থিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতমা। **মহামায়ূরীতেও** অচলাকে রাক্ষসীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) অচলা (সং, অ-চলা—অর্থাৎ গতিহীনা)।

গণ্ডব্যূহ ও **সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে** অচলাকে নারীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। **গণ্ডব্যূহে** ৫৫ জন প্রাজ্ঞ পরামর্শদাতার একজন এবং **সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে** সুন্দর-হালকা সবুজবর্ণা অচলাকে হারিতীর দশটী কন্যার মধ্যে অন্যতমা রূপে বিখ্যাত বলা হয়েছে, যার কাজ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির বিশুদ্ধি রক্ষা করা।

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অচিরবতী

অচিরবতী পালি সাহিত্যে বর্ণিত পঞ্চমহানদীর (Vin,-II 237) (গঙ্গা, যমুনা, সরভূ, মহী এবং অচিরবতী) অন্যতম; ইহার বর্তমান নাম রাপ্তী (ঐরাবতী)। শ্রাবস্তী নগর

এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অবদানশতকে অজিরবতী, আর জৈন কল্পসূত্রে 'এরাবৈ' (Erāvai) নামে নদীটি উল্লিখিত হয়েছে। হিউয়ান্-সাং এর নাম 'অচিলো (A-Chi-lo) বলে উল্লেখ করেছেন। পালি **টীকাকারগণ** তাঁদের অট্ঠকথায় হিমালয়স্থ অনোতত্ত (অনবতপ্ত) মহাসরোবর (হ্রদ) থেকে এই পাঁচটি নদীর উদ্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। মনসাকট নামক ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রামের উত্তর দিকে এই নদীতীরস্থ আম্রবনে বুদ্ধ মাঝে মাঝে অবস্থান করতেন; কোন এক উপলক্ষ্যে এই খানেই তিনি **তেবিজ্জ সুত্তটি** (**দীঘনিকায়** ১৩নং সুত্ত) দেশনা করেছিলেন। এই নদীটিকে লক্ষ্য করে এই **সুত্তে** নদীটির সঙ্কেত করা হয়েছে—

সেয্যথা পি বাসেট্ঠ অয়ং অচিরবতী নদী পূরা উদকস্স সমতিত্তিকা কাকপেয্যা, অথ পুরিসো আগচ্ছেয্য পারত্থিকো পারগামী পারং তরিতুকামো···

(**দীঘনিকায়**, পৃ. ২৪৪, পং, ১৩-১৬)

সুকুমার সেনগুপ্ত

অচ্চুতবিক্কন্ত—

বুদ্ধদত্ত বলেন যে, অচ্চুত বিক্কন্ত চোল রাজ্যে রাজত্ব করতেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর সময় তামিল দেশে বহু বৌদ্ধমঠ স্থাপিত হয়েছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তিনি খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তামিল লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি চোল, চের ও পাণ্ড্যবংশীয় তিনজন নরপতিকে বন্দী করে রেখেছিলেন। খৃঃ পঞ্চম শতকে তিনি রাজত্ব করতেন। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে তামিল রাজ্যে পল্লব ও পাণ্ড্য রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে কলভ্র জাতির অবসান ঘটেছিল। তিনি কলভ্র জাতির অধিপতি ছিলেন। কলভ্র জাতি খুব অত্যাচারী ছিল। অচ্চুত বিক্কন্তের অধীনে কলভ্রজাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

দ্রষ্টব্য: *Buddhadatta's Manual, II*, Introduction, p. XVI.

বেলা ভট্টাচার্য

অচ্ছরিয়-অব্ভুত-ধম্মসুত্ত—

পালি সাহিত্যের বিভিন্ন নিকায়-গ্রন্থে 'অচ্ছরিয় অব্ভুত ধম্ম' নামে পাঁচটি সুত্ত রয়েছে। এগুলির মধ্যে চারটি **অঙ্গুত্তরনিকায়ে** ও একটি **মজ্ঝিমনিকায়ের** অন্তর্গত। সুত্তগুলির মূল বিষয়-বস্তু বুদ্ধ, বুদ্ধ-শিষ্য অথবা চক্রবর্তী রাজার অলৌকিক গুণ ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ ও বর্ণনা। **অঙ্গুত্তরনিকায়ে** (সূত্র সংখ্যা ১২৭) চতুষ্ক নিপাতের অভয়-বর্গের সূত্রটিতে সম্যক্ সম্বুদ্ধের পৃথিবীতে আবির্ভাবের কালে যে সকল অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ সৃষ্ট হয় তা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তুষিত স্বর্গলোক থেকে মর্ত্তলোকে মাতৃগর্ভে বোধিসত্ত্বের-প্রবেশকালীন সময়ে এক দিব্য জ্যোতি আবির্ভূত হয়। সেই দিব্য জ্যোতির আলোকে উদ্ভাসিত হয় সর্বলোক—এমন কি ঘনতমিস্রায় আবৃত লোকান্তরিক নরকগুলিও আলোকিত হয়। অনুরূপভাবে বোধিসত্ত্বের মাতৃজঠর থেকে নির্গমনকালে, সম্যক্-সম্বোধিলাভের এবং ধর্মপ্রচার প্রবর্তনা কালেও নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় সূত্রে (সূত্র সংখ্যা ১২৮) সম্যক্-সম্বোধির আবির্ভাবকালে আরো চার-প্রকারের

আশ্চর্যজনক ঘটনা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন স্তরের লোক তাঁদের কর্ম পরিহার করে তথাগতের উপদেশ শ্রবণের পরে জ্ঞানমার্গে প্রতিষ্ঠিত হন।

তৃতীয় সূত্রে (সূত্র সংখ্যা ১২৯) বুদ্ধ শিষ্য আনন্দের চারটি অলৌকিক ক্ষমতার কথা বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ সূত্রটিতে (সূত্র সংখ্যা ১৩০) আনন্দের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতার কথা বিবৃত করে রাজচক্রবর্ত্তীর ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

মজ্ঝিমনিকায়ের (১২৩ সংখ্যক সূত্র) সূত্রটিতে তথাগতের অধিগত বাইশ প্রকার আশ্চর্যজনক অলৌকিক অদ্ভুত-ধর্ম বা গুণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম উনিশটি অলৌকিকগুণ বোধিসত্ত্বের সম্বোধি লাভের ঠিক পূর্বভাগেই আবির্ভূত হয়। এই উনিশটি অলৌকিক ক্ষমতা আনন্দ কর্তৃক পরিজ্ঞাত ও সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অলৌকিক ক্ষমতাগুলি হোল—(১) বোধিসত্ত্ব তুষিতস্বর্গে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন (সতো সম্পজানো), (২) তুষিত স্বর্গে অধিষ্ঠানকালে বোধিসত্ত্ব সর্বদা সেখানে তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন থাকেন, (৩) তিনি সেখানে সম্পূর্ণ কল্পযুগধরে (যাবকপ্প) বাস করেন, (৪) তিনি সজ্ঞানে ও সপ্রজ্ঞায় তুষিত লোক পরিত্যাগান্তে মাতৃজঠরে প্রবেশ করেন, (৫) মাতৃজঠরে প্রবেশ কালে এক অনন্যসাধারণ জ্যোতিঃরাশি আবির্ভূত হয় এবং সেই আলোকে সর্বাপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকন্তরিকা নামক প্রেত-লোকও আলোকিত হয়, (৬) বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে প্রবেশ কালে চারজন দেবপুত্র চারদিক থেকে তাঁকে রক্ষা করেন, (৭) বোধিসত্ত্বের মাতা গর্ভে বোধিসত্ত্বধারণ করার দিন থেকে শীলবতী হন এবং চার প্রকার গুরুতর অপরাধ কর্ম থেকে বিরতা হন, (৮) বোধিসত্ত্বের গর্ভধারণ করেই অন্য কোন পর-পুরুষের প্রতি নিরাসক্ত হন, (৯) বোধিসত্ত্বমাতা কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয় বস্তুসমূহ সহজেই লাভ করেন, (১০) তিনি শারীরিক অসুস্থতার দ্বারা পীড়িত না হয়ে আরামপ্রদ ও ক্লান্তিবিহীন যাপন করেন, (১১) বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করার সাতদিন পরেই তিনি দেহত্যাগ করে তুষিত স্বর্গে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, (১২) অন্যান্য স্ত্রীগণের মত বোধিসত্ত্বমাতা দশমাস গর্ভধারণান্তে প্রসব করেন, (১৩) তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় সন্তান প্রসব করেন, (১৪) জন্মাবার পরেই বোধিসত্ত্ব প্রথমে দেবগণের দ্বারা এবং পরে মানুষের দ্বারা গৃহীত হন, (১৫) বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হন এবং চারজন দেবপুত্র বোধিসত্ত্বকে অভিনন্দিত করে গ্রহণ করেন। এই দেবপুত্রগণ বোধিসত্ত্বকে ও তাঁর মাতাকেও অভিনন্দন জানান, (১৬) বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ কাল থেকেই চির পবিত্র ও শুদ্ধ থাকেন। রুধির প্রভৃতি অশুচি ও দুর্গন্ধময় কায়িক অশুচি থেকে তিনি পরিমুক্ত থাকেন, (১৭) বোধিসত্ত্ব জন্মাবার পর যুগপৎ আকাশ থেকে উষ্ণ ও শীতল জল প্রবাহিত হয়। বোধিসত্ত্ব ও বোধিসত্ত্ব মাতা সেই উক্ত জলে অবধৌত হন, (১৮) জন্মলাভের অব্যবহিত পরে বোধিসত্ত্ব উত্তর দিকে সপ্ত-পদ চলেন। এই চলার সময় বোধিসত্ত্বের মস্তকোপরি দিব্যশ্বেতচ্ছত্র আবির্ভূত হয়। বোধিসত্ত্ব সেই মুহূর্তে ঘোষণা করেন—'আমিই জগত শ্রেষ্ঠ, এটাই আমার অন্তিম জন্ম, এবং আমার পুনর্জন্ম নেই', (১৯) বোধিসত্ত্বের জন্মমুহূর্তে এক অসাধারণ দিব্য জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয় ও দশসহস্র লোক কম্পিত হয়।

এই উনিশটি অদ্ভুত ধর্ম ছাড়াও বুদ্ধদেব কর্তৃক আরো তিনটি গুণ, যথা—বেদনা, সংজ্ঞা ও বিতর্ক উল্লিখিত হয়েছে। এ গুণগুলি কেবলমাত্র বোধিসত্ত্বের দ্বারা উপলব্ধ হয়।

অদ্ভুত-ধর্মের বর্ণনা কেবল উপরে বর্ণিত সূত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। পালি সাহিত্যের অন্যত্র অনুরূপ অদ্ভুত-ধর্মের বর্ণনা রয়েছে। **উদান** এবং **মজ্ঝিমনিকায়ে** (সূত্র সংখ্যা ১২৪) কতকগুলি অদ্ভুত-ধর্ম বা অলৌকিকগুণের কথা বর্ণিত আছে।

সাধন সরকার

অজন্তা (অজণ্টা)

প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তির নিদর্শন অজণ্টার (২০°-৩২′ অক্ষাংশে এবং ৭৫°-৪৮′ দ্রাঘিমাংশে) শিলোৎখাত (rock-cut) গুহাবলী। গুহাবলীর অভ্যন্তরস্থ চিত্র-কলা পরিকল্পনা ও সৌন্দর্যে সমগ্র বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এবং ভারতীয় চিত্রকলার অনুপম সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অজন্তা মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত। গুহাশ্রেণীর সাত মাইল দূরে অবস্থিত 'আজুন্থা' গ্রামের নাম থেকে সম্ভবতঃ গুহাগুলির 'অজণ্টা' নামকরণ হয়েছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যের জেলা-সদর ঔরঙ্গাবাদ থেকে প্রায় ১০১ কিলোমিটার (৬৩ মাইল) দূরে এবং জলগাঁও রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৫৫ কিমি. (৩৪ মাইল) দূরে অবস্থিত। গুহাগুলির সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত গ্রামটির নাম ফর্দাপুর।

অজন্তা গুহাগুলটি একসময় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের তথা বৌদ্ধধর্মের প্রাণবন্ত কেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন যুগে পরিব্রাজকগণ এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন। এ'দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিলেন হিউয়েন্ সাঙ্। এই চীনদেশীয় পরিব্রাজক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-পীঠটির একটি অনুপম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বৌদ্ধ কেন্দ্রটি অনেকদিন ধরে স্মৃতিতে অবলুপ্ত ও অনাবিষ্কৃত ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কতিপয় ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের সর্বপ্রথম এই স্থানটি দৃষ্টিগোচর হয় এবং এই পুরাকীর্তিটির অস্তিত্ব জনসাধারণ জানতে পারে। পরবর্তী কালের অনুসন্ধিৎসায় অজন্তার শৈলখাত গুহাগুলির চিত্রলিপির উপর Major Gill, Jhon Griffith, প্রবন্ধাদি লিখে মানব সমাজে অজন্তাকে উদ্ভাসিত করেন।

প্রায় ৭৬ মিটার (২৫০ ফিট) উঁচু বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীর পাশ কেটে অজন্তার খাড়া গুহাগুলি নির্মিত হয়েছে। পর্বতশ্রেণীর নীচে প্রবাহিত ওয়াঘোড়া নদী। গুহাগুলি প্রায় ৩৫ ফিট থেকে ১১০ ফিট পর্যন্ত উঁচু এবং ৫৪৯ মিটার পরিধিতে অর্ধবৃত্তাকারে অবস্থিত। সবগুলি গুহা একই সময়ে নির্মিত না হওয়ায় পরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই এদের তলগুলি অনুভূমিক নয়। প্রায় প্রতিটি গুহার নীচে প্রবাহিত ওয়াঘোড়া নদী পর্যন্ত সোপানশ্রেণী ছিল বলে অনুমিত, কারণ এই সোপানগুলির মধ্যে দুটি এখনও অবশিষ্ট আছে। অজন্তার মোট ত্রিশটি গুহা আবিষ্কৃত। এদের মধ্যে কয়েকটি বিহার বা সংঘারাম এবং বাকী সব বৌদ্ধ চৈত্য, অর্থাৎ ৯, ১০, ১৯, ২৬ ও ২৯ সংখ্যক গুহাগুলি চৈত্যগৃহ এবং অন্যগুলি বিহার বা সংঘারাম। বিহারগুলির স্থাপত্যে প্রাচীনকালের কাঠের উপর নির্মিত স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব দেখা যায়।

গুহাগুলিতে দুইটি যুগের স্থাপত্যকলার নিদর্শন আছে। এই দুই যুগের মধ্যে পার্থক্য প্রায় চার-শতকের। এদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে খৃষ্টপূর্ব যুগে নির্মিত ছয়টি গুহা (৬, ৮, ১২, ১৩ ও ৩০) প্রাচীনতম, ছয় এবং আট সংখ্যক গুহাদ্বয় চৈত্য পর্যায়ের এবং অবশিষ্ট চারটি সংঘারাম। চৈত্যগৃহের দ্বারের উপরিভাগে 'চৈত্যগবাক্ষ' নামে অভিহিত 'অশ্বখুরাকৃতি' বাতায়ন সম্মুখভাগের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। স্থাপত্যকলার নিদর্শনে এগুলি পশ্চিমভারতীয় কার্লি, ভাজা, বেদশা প্রভৃতি চৈত্যশিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। চৈত্যগৃহগুলির অভ্যন্তরে স্তম্ভগুলির আসন (ground plan) শূর্পাকৃতির। গুহাগুলির চালের নীচের দিকটি অর্ধবৃত্তাকার এবং কড়ি-বর্গা লাগানোর পদ্ধতি ছিল বলেই অনুমিত। চৈত্যগৃহগুলি ছিল দেবায়তন এবং অভ্যন্তরস্থ স্তূপ ছিল আরাধ্য বস্তু। বুদ্ধমূর্তির অনুপস্থিতিই চৈত্যগুলির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করে। সংঘারাম বা বিহার বলে অনুমিত গুহাগুলিতে ভিক্ষু ও শ্রমণগণের সমাবেশের জন্য একটি অতি প্রশস্ত দর-দালান ছিল এবং তার তিনদিকে অবস্থিত প্রকোষ্ঠগুলি (cell) ভিক্ষুগণের আবাসস্থলরূপে ব্যবহৃত হোত। এই প্রাচীন গুহাগুলিতে সাতবাহনযুগের শিল্প ও ভাস্কর্যরীতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পর্বায়ে নির্মিত গুহাসমূহ খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত এবং বাকাটক-যুগের স্থাপত্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত। গুহা-চিত্রের মধ্যে একটি বাকাটক-যুগের শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। ষোল সংখ্যক গুহায় বাকাটকরাজ হরিষেণের (৪৭৫-৫০০ খৃষ্টাব্দ) মন্ত্রী বরাহদেবের এবং সতের সংখ্যক গুহা হরিষেণের অধীনস্থ এক সামন্তরাজের উৎসর্গ-লেখা সম্বলিত। গুহানির্মাণের দ্বিতীয়-ধাপে বিশিষ্ট সংঘারাম গঠনরীতি উদ্ভাবিত হয়। ফলতঃ এই গুহাগুলির অভ্যন্তরে প্রথমে অলিন্দ এবং অলিন্দের পশ্চাৎদেশে স্তম্ভযুক্ত প্রশস্ত মণ্ডপ এবং মণ্ডপের তিন দিকে আবাসিক ভিক্ষু বা শ্রমণদের ব্যবহার্য প্রকোষ্ঠশ্রেণী নির্মিত হয়। মণ্ডপের পেছনসারির স্তম্ভের কেন্দ্র-বিন্দুতে বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ চৈত্যগৃহ সমূহে এ ধরনের স্থাপত্য-পরিকল্পনা দৃষ্ট হলেও প্রায় প্রতিটি সংঘারাম বা চৈত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখ্য ছয়-সংখ্যক দ্বিতলবিশিষ্ট গুহাটি। আবার প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ এবং সপ্তদশ সংখ্যক গুহাগুলি স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পকলার সৌন্দর্যে বিশিষ্টতর। গুহার প্রাচীরগাত্র, স্তম্ভ ও চালে খোপে-খোপে (panel) অঙ্কিত চিত্রগুলি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও জাতক-কাহিনীতে সমৃদ্ধ। এছাড়া বিভিন্ন তরুলতা, ফুল ও পশুপাখীর 'মোটিফ'-ও রয়েছে। চিত্রগুলির প্রাণময়তা ও স্বাভাবিকতা আজও আকর্ষণের বিষয়। চিত্র-পরিকল্পনাতে অতি উচ্চ মানের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ও পণ্ডিতজন কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। নবম ও দশম সংখ্যক গুহার লিপিও প্রাচীন শিল্পরীতির পরিচায়ক এবং বৈশিষ্ট্যে ভাজা, সাঁচী, অমরাবতী, জগয্যপেটার শিল্পকানের সঙ্গে তুলনীয়। তাই এই গুহাগুলিকে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের সৃষ্ট বলে মনে করা হয়। শিলালিপিগুলি আদি ব্রাহ্মী হরপে লেখার জন্য প্রাচীনত্ব নির্ণয় করাও অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়েছে। চিত্রকলাগুলি সাতবাহনের যুগেই অঙ্কিত হয় বলে অনুমিত। পরবর্তীকালের অঙ্কিত চিত্রগুলি দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ে পারস্যরাজার বদান্যতায় সৃষ্ট বলে অনেকে মতপোষণ করলেও পণ্ডিতগণের অনেকেই এ অভিমতকে গুরুত্ব দেননি।

অজন্তা গুহার চিত্রসমূহ Tempera পদ্ধতিতে অঙ্কিত। অঙ্কনের উপাদান-সামগ্রী অতি সাধারণ পার্থিববস্তু থেকে গৃহীত। কেবলমাত্র পাঁচটি রঙের সাহায্যে চিত্রিত করা যে পদ্ধতি ভারতীয় শিল্পসাহিত্যের গ্রন্থে বর্ণিত আছে অজণ্টা-তে তার সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের গিরিমাটি, ভুসো কালি, চুণ, নীলরঙের ল্যাপিস লাজুলি পাথর, রঙের বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে আলেখ্যের ভূপৃষ্ঠটি (ground) কাদামাটি, তুষ, গদ ও সবুজজাতীয় অন্য বস্তুর মিশ্রণে তৈরী পদার্থের দ্বারা পুরু আস্তরণ (layer) দেওয়া হয়েছে। এর ওপর পাতলা চুণের প্রলেপ দেওয়া হয়। আলেখ্যের বহিরেখা (outline) কালো বা গাঢ়-পিঙ্গলে রঙের সাহায্যে টানা হয়েছে। পরে বিভিন্ন রঙের সমাবেশে রেখাগুলির ভিতরের অংশ পূরণ করা হয়। আলো-আঁধারির প্রতিফলনের বিন্দু (বিন্দু-বর্তনা) ও রঙের ডোরা (পত্র-বর্তনা) ব্যবহার করা হয়েছে। রেখাগুলি এত স্পষ্ট ও গভীর যে একটি চিত্র থেকে অন্য চিত্রটি সহজেই পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতীয় শিল্পগ্রন্থ **'বিষ্ণুধর্মোত্তরে'** বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী চিত্রশিল্পিগণ অত্যন্ত দক্ষতা এবং স্বাভাবিকতায় চিত্র-বিষয়টি ললিত-সৌন্দর্যে অভিব্যক্ত করেছেন। চিত্রের বিষয়গুলিতে জগত ও জীবনের পারিপার্শ্বিকতার দিকটি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। পশুপাখী, প্রকৃতি, ফুল, ফল ও লতাপাতার মোটিফ-সমারোহ চিত্র-রচনার বিষয়ে তাই প্রধান স্থানও লাভ করেছে। জাতক ও অবদান কাহিনীগুলির চিত্রপটেই এদের বহুল ব্যবহার চিত্ররূপকে অনুপম সৌন্দর্যে বিকশিত করেছে।

পূর্বে উল্লিখিত ত্রিশটি গুহার মধ্যে পাঁচটি চৈত্যশ্রেণীর ও বাকী পঁচিশটি সংঘারাম বা বিহার পর্যায়ের। এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি অর্ধধ্বংস অবস্থায় প্রাপ্ত।

প্রথম গুহাটি বারান্দা, দর-দালান, বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণের জন্য সংরক্ষিত স্থান (sanctuary) ও ভিক্ষুপ্রকোষ্ঠে সমন্বিত। বিশেষতঃ স্তম্ভগুলি বাকাটক-গুপ্তযুগের স্থাপত্য-কলার প্রভাবে নির্মিত। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ জীবনের কাহিনী যেমন—শ্রাবস্তীর প্রাতিহার্য ঘটনা, মারদর্শন, সিদ্ধার্থ-যশোধরা এবং অন্যান্য মোটিফের অলঙ্করণ গুহাগাত্রের চিত্রগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া শিবি, শঙ্খপাল, মহাজনক ও চাম্পেয় জাতক সমূহ এ-গুহার চিত্রাঙ্কনের বিষয় হয়েছে।

দ্বিতীয় গুহাটিও একটি বিহার বা সংঘারাম শ্রেণীর। প্রথমটির ন্যায় চৈত্যের মধ্যভাগ-স্থিত দেবস্থানে (sanctuary) বুদ্ধ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। চিত্রগুলির মধ্যে একটি বিশালাকারের বোধিসত্ত্ব, মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন, তুষিত, স্বর্গলোক থেকে বোধিসত্ত্বের অবতরণ, বোধিসত্ত্বের জন্ম ও সপ্তপাদ ভ্রমণ উল্লেখ্য ও দৃষ্টিনন্দনকারী। জাতকগুলির মধ্যে হংসজাতক, বিধুর পণ্ডিত, রুরু এবং পূর্ণাবদান চিত্রিত আছে। জাতকমালার মধ্যে ক্ষান্তি-জাতকের কয়েকটি গাথার চিত্ররূপ দৃষ্ট।

তৃতীয় গুহাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আবিষ্কৃত একটি বিহার মাত্র।

চতুর্থ গুহাটিও অনুরূপ অসমাপ্ত বিহার। গুহাদ্বারের অলঙ্করণ অত্যন্ত রমণীয়। গুহার অভ্যন্তরে বারান্দাযুক্ত প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে-স্থিত স্তূপে বিশালকায় বুদ্ধের মূর্তি আকর্ষণীয়।

পঞ্চম গুহাটিও অসমাপ্ত কিন্তু গুহাদ্বারটি অলঙ্কারে সুসজ্জিত।

ষষ্ঠ গুহাটি দ্বিতলবিশিষ্ট। এই গুহার প্রবেশদ্বারটিও সু-অলঙ্কৃত। অভ্যন্তরে ধর্মচক্র-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আছে। চিত্রগুলির মধ্যে শ্রাবস্তীর প্রাতিহার্য এবং মার-প্রলোভন দৃশ্যটি উল্লেখ্য। দণ্ডায়মান বুদ্ধ-মূর্তিও চারপাশের প্রাচীরে খোদিত আছে। চিত্রকলা প্রায় সবকটি নষ্টপ্রাপ্ত।

অষ্টম গুহাটি সংঘারাম এবং ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

নবম গুহাটি চৈত্যশ্রেণীর এবং সম্মুখভাগ (Fascade) অতি মনোগ্রাহী। চৈত্যের অভ্যন্তরটি স্তম্ভ, অলিন্দ এবং উদ্দেশিক স্তূপ-সম্বলিত। চিত্রকলায় দুইটি যুগের লক্ষণ সূচিত হয়েছে।

দশম গুহাটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চৈত্যগৃহ। এর অভ্যন্তরে একটি নিবেদন স্তূপ (Votive Stupa) রয়েছে। চৈত্য-প্রাচীর গাত্রের উৎকীর্ণ শিলালেখটি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বলে অনুমিত। চিত্রকলার মধ্যে বোধিবৃক্ষের পূজা, সামজাতক এবং ছদ্দন্তজাতক উল্লেখ্য।

একাদশ সংখ্যক গুহাটি একটি বিহার। এখানে একটি আসীন বুদ্ধমূর্তি এবং প্রসিদ্ধ একশীর্ষবিশিষ্ট চতুর্মুখের ভাস্কর্য অনবদ্য।

দ্বাদশ-সংখ্যক গুহাটি একটি প্রাচীনকালীন সংঘারাম। আদি ব্রাহ্মীলিপির অস্তিত্ব এর প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে সাহায্য করে।

ত্রয়োদশসংখ্যক গুহাটিও একটি প্রাচীন সংঘারাম এবং চতুর্দশ সংখ্যক গুহাটি একটি অসমাপ্ত বিহার মাত্র।

চতুর্দশসংখ্যক বিহারটি অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত।

পঞ্চদশ-সংখ্যক গুহাটিও একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহার।

ষোড়শ-সংখ্যক গুহাটি অজন্টার অন্যতম প্রসিদ্ধ ও সুন্দর বিহার। এই গুহায় বাকাটক-রাজার মন্ত্রী বরাহদেবের আনুকূল্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি গুহাটির কালনির্ণয়ে সাহায্য করে। গুহাটির অভ্যন্তরের সজ্জা অত্যন্ত সুচারুরূপে কল্পিত। প্রাচীরের গায়ে অঙ্কিত বিষয়গুলির মধ্যে নন্দের ধর্মান্তর গ্রহণ, শ্রাবস্তীর প্রাতিহার্য, সুজাতার পরমান্ন প্রদান, ত্রপুষ ও ভল্লিকবন্ধু, ভূমিকর্ষণ, ঋষি অসিতের বোধিসত্ত্বপরিদর্শন, সিদ্ধার্থ-রাজকুমারের বিদ্যালয়-গমন এবং

মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন প্রধান। এ ছাড়া হত্থী, মহা-উম্মগ্‌গ এবং সুতসোম জাতক চিত্রিত হয়েছে।

সপ্তদশ-সংখ্যক গুহায় বাকাটকরাজ হরিষেণের এক সামন্তরাজ কর্তৃক ক্ষোদিত শিলালিপি গুহাটির বারান্দায় উৎকীর্ণ আছে। কয়েকটি বুদ্ধমূর্তির সৌন্দর্য অতুলনীয়। গুহার অভ্যন্তরস্থ মণ্ডপে বুদ্ধ-মূর্তিটির দুই পার্শ্বে পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি বোধিসত্ত্বের দ্বারা অলংকৃত। এ ছাড়া বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ এবং শাক্যমুনি বুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত আছে। জাতকের মধ্যে ছদ্দন্ত, মহাকপি, হত্থী, হংস, বেস্সন্তর, সরভমিগ, মচ্ছ, মাতিপোসক, সাম এবং মহিস উল্লেখ্য। দিব্যাবদানের কয়েকটি কাহিনীও গুহা-প্রাচীরের চিত্রে স্থান পেয়েছে।

অষ্টাদশ-সংখ্যক গুহাটি অসমাপ্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত।

ঊনবিংশতি-সংখ্যক গুহাটি আদর্শ চৈত্যগৃহের নিদর্শন। প্রান্তে স্থিত স্তূপে বুদ্ধ মূর্তিতে ক্ষোদিত হয়েছে। গুহার সম্মুখভাগটি নিপুণ ভাস্কর্যশিল্পের দৃষ্টান্ত ও ক্ষুদ্র-প্রসারিত বারান্দা অশ্বক্ষুরাকৃতি গবাক্ষবিশিষ্ট। অভ্যন্তরস্থিত গুহাপ্রাচীরে রাহুল-যশোধরার সম্মুখে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে চিত্রিত বুদ্ধ-মূর্তিটি অপরূপ সৌন্দর্য-সমন্বিত।

বিংশতি-সংখ্যক গুহাটিও একটি চৈত্য। এর মধ্যে একটি ভগ্নশিলালেখ পাওয়া গিয়েছে।

একবিংশতি-সংখ্যক গুহাটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

দ্বাবিংশতি-সংখ্যক গুহাটিও চৈত্যধরণের। বুদ্ধমূর্তি ছাড়া কয়েকটি মানুষী-বুদ্ধ, মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে।

ত্রয়োবিংশতি ও চতুর্বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক বিহারগুলিও অসমাপ্ত বিহার মাত্র।

ষড়্‌বিংশতি-সংখ্যক গুহায় প্রলম্বিত ভঙ্গীতে বুদ্ধের মূর্তি দৃষ্ট।

সপ্তবিংশতি ও অষ্টবিংশতি এবং ত্রিশংসংখ্যক গুহাগুলিও বিহার শ্রেণীর।

ঊনত্রিংশৎ-সংখ্যক গুহাটি একটি চৈত্য। কিন্তু উল্লিখিত গুহাগুলি অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : G. Yazdani, *Ajanta* I-IV ; Devala Mitra, *Ajanta* ; *Encyclopaedia of Buddhism*, Vol. I. p. 300-11.

সাধন সরকার

অজপাল নিগ্রোধ—

অজপাল নিগ্রোধ একটি বৃক্ষের নাম। ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যে একটি বিখ্যাত বৃক্ষ। উরুবিল্ব গ্রামে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষের নিকট এই বৃক্ষ অবস্থিত। ভগবান বুদ্ধের বোধি-সত্ত্বলাভের এক সপ্তাহ পরে এই বৃক্ষের তলে উপবেশন করে এক সপ্তাহ বুদ্ধদেব অতিবাহিত করেন। দু সপ্তাহ পরে বুদ্ধদেব পুনরায় তথায় গিয়েছিলেন। সেখানে ব্রহ্মা-সহম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি ভগবান বুদ্ধকে ধর্ম **দেশনা** করতে অনুরোধ করেছিলেন। পরে তপস্সু ও ভল্লুক-এর নিকট থেকে খাদ্য গ্রহণ করেন (**মজ্ঝিম-অট্ঠকথা** ১/৩৮৫ ; *PPN* I, 30)। ভগবান বুদ্ধের নিকট সহম্পতি উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বুদ্ধের ধর্মকে উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। এই বৃক্ষের নিম্নে ভগবান বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত করেছিলেন এবং এখানেই ভগবান বুদ্ধ সুজাতার দেওয়া পায়সান্ন গ্রহণ করেছিলেন।

দ্রষ্টব্য : **দীঘনিকায়**, ২য়, পৃঃ ২৬৭ ; **বিনয়**, ১ম, পৃঃ ২-৩।

বেলা ভট্টাচার্য

অজাতশত্রু

অজাতশত্রু সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। যখন অজাতশত্রু মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন নাকি তাঁর মাতার স্বামীর রক্তপানের ইচ্ছা হয় এবং গোপনে তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন। জন্ম হবার আগে হতেই পিতার শত্রুতা করেছেন বলেই তাঁর নাম হয় অজাতশত্রু তবে এগুলি কল্পনা প্রসূত গল্প।

অজাতশত্রু তাঁর পিতা বিম্বিসারের পর মগধের সিংহাসনে বসেন। বৌদ্ধ কিম্বদন্তীতে তাঁকে পিতৃহন্তা বলা হয়েছে। বুদ্ধের খুড়তুতো ভাই এবং শ্যালক দেবদত্তর প্ররোচনায় অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করে এবং বুদ্ধকে হত্যার ষড়যন্ত্রে দেবদত্তকে সাহায্য করেছিলেন (সু, বি, ১, ১১৫-১৭০)।

অজাতশত্রু রাজ্য বিস্তারের নীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করে রাজ্যের সীমানা সুদূর সম্প্রসারিত করেছিলেন। মগধ ব্যতীত উত্তরে অঙ্গ, বারাণসী এবং বৈশালী তাঁর সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যা বজিরাকে বিবাহ করে বিতর্কাধীন কাশীগ্রাম উপঢৌকন স্বরূপ পেয়েছিলেন (স, নি, ১, ৮২-৮৬)।

প্রথমে অজাতশত্রু দেবদত্তর অনুগামী ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর জন্য অনুশোচনা করেন। সুবিখ্যাত চিকিৎসক জীবকের অনুরোধে এবং পরামর্শে বুদ্ধের অনুগামী হন। জীবকের প্রচেষ্টায় অজাতশত্রু বুদ্ধের দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিকট স্বকৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। **দীঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্তে** অজাতশত্রুর বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন এবং ভিক্ষু সঙ্ঘকে শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ আছে। "রাজা মাগধো অজাতশত্রু বিদেহিপুত্ত ভগবন্তম্ অভিবাদেত্বা ভিক্খু সঙ্ঘ অঞ্জলিম্ পণামেত্বা একম্ অন্তম্ নিসিদি" (দী, নি, ১, ৫০-৫১) **দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বানসুত্তন্তেও** বুদ্ধের প্রতি রাজার শ্রদ্ধার কথা বর্ণনা আছে। "মাগধো অজাতসত্তু বিদেহীপুত্ত ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতি" (ডা, ই, ৬০)। তিনি বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত হয়েছিলেন।

অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টমবর্ষে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ ঘটেছিল (ম, ব, ২.০২)। তিনি এই সংবাদে শোকাহত হন এবং তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনি মত্ত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেছিলেন (সু, বি, ২, ৬০৫-৬০৬) ষষ্ঠ শতাব্দীর তোচারিয়ান যুগের উত্তর-মধ্য তুর্কিস্থানের কুচের কুইজলে আবিষ্কৃত এক স্তূপের প্রাচীর চিত্র হতে জানা যায় যে তাঁকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কথা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত জানান হয়। যখন তিনি গলানো মাখনে স্নান করছিলেন সেসময়ে তাঁর মন্ত্রী ভস্মকার মোটা কাপড়ে আঁকা বুদ্ধের জীবনের ঘটনাগুলি যেমন রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম, তাঁর বোধিজ্ঞান লাভ, তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ, কুশিনগরের সাল-কুঞ্জে তাঁর মহাপরিনির্বাণ—দেখানোর দ্বারা কোন কথা না বলে তাঁকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের খবর জানানো হয়। যখন তিনি শেষ দৃশ্যে অপূরণীয় ক্ষতির কথা জানতে পারেন, গভীর দুঃখে ও নৈরাশ্যে কেঁদেছিলেন (জিমার, ২০৩—২০৪)। তিনি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে উপস্থিত মল্লদের নিকট বুদ্ধের দেহাস্থি দাবী করে তাঁর মন্ত্রীকে পাঠান। "ভগবান বুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং আমিও তাই"। "ভগবা পি ক্খত্তিয়ো অহম পি ক্খত্তিয়ো" (দী, নি, ২, ১৬৪)। তিনি বুদ্ধের দেহাস্থির উপর এক পাথরের স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। রাজগৃহের চারিদিকে কতকগুলি ধাতু-চৈতিয় বানিয়েছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর রাজগৃহে পরিত্যক্ত আঠারটি মহাবিহার তিনি আবার সারিয়ে ভিক্ষুদের বসবাসের যোগ্য করেছিলেন (স, পা, ১, ৯—১১)।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুই মাস পরে রাজগৃহের বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণি গুহায় প্রথম বৌদ্ধ সভা (ধর্ম সংগীতি, বৌদ্ধ সংগীতি) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায়

ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। **বুদ্ধ-প্রব্রজিত** সুভদ্র ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুদের ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণে-কাঁদতে দেখে তিনি বলেন, "আপনারা রোদন করবেন না, এখন আপনারা স্বাধীন, যাহা খুশী তাহা করতে পারবেন" (বাপাট, ৩৫—৩৬)। তাঁর কটূক্তি বৌদ্ধসঙ্ঘে এক মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। ভিক্ষুগণ ক্ষুব্ধ হয়ে রাজগৃহে এই বৌদ্ধসভার আয়োজন করেছিলেন। অজাতশত্রু ইহা সাফল্যমণ্ডিত করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি গুহার বহির্দ্বারে এক সুন্দর সুবৃহৎ ঘর তৈরী করে মূল্যবান মাদুরে সাজিয়েছিলেন। তিনি ঘরের ডান দিকে সভাপতি থেরের এবং মাঝখানে আবৃত্তিকারী ভিক্ষুর বসবাস ব্যবস্থা করেছিলেন (ম, সে, ২৩০)। তিনি বৌদ্ধ সভায় অংশগ্রহনকারী পাঁচশত ভিক্ষুর খাবার, শোবার এবং থাকবার আয়োজন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর জন্যই বুদ্ধ মগধবাসীর মন জয় করতে পেরেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম মগধ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি চব্বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

প্রাচীন জৈন গ্রন্থে অজাতশত্রুকে মহাবীরের অনুগামী বলা হয়েছে।

কানাইলাল হাজরা

অজিত কেসকম্বলী—ইঁনি বুদ্ধের সমসাময়িক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ন-সন্তি পরলোক-বাদী", নাস্তিক, উচ্ছেদবাদী তীর্থঙ্কর। হার্ডি সাহেব সিংহলী গ্রন্থে রক্ষিত বৌদ্ধ ঐতিহ্য থেকে এঁ'র সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত সঙ্কলন করেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে তিনি প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন ; প্রভুর ভর্ৎসনা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যান। এবং পরে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মতে একটি লতা ছেদন করা ও কোন প্রাণী হত্যা করা দুইই একই রূপ পাপ বলে গণ্য ; মাছ মারা ও মাছ খাওয়া উভয়ই একই ধরণের অপরাধজনক। **দীঘনিকায়** গ্রন্থের **সামঞ্ঞফল-সুত্তে, মজ্‌ঝিমনিকায়ের সন্দক সুত্তে** তাঁর মতবাদ বর্ণিত হয়েছে। এই তীর্থিকের মতে যাগ, যজ্ঞ, হোম, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য, দানাদি কর্মের কোনও ফলাফল নেই ; ইহলোক-পরলোক বলতে কিছু নেই। চতুর্মহাভূতময় পুরুষের মৃত্যুর পর, ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি অংশ চতুর্ভূতের সঙ্গে মিশে যায় ও ইন্দ্রিয়গুলি আকাশে লীন হয়ে যায় ; দেহান্তে কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেরই অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। কিছুই থাকে না। এক কথায় অজিত কেসকম্বল উচ্ছেদবাদনীতির পরিপোষক ছিলেন। **সন্দক সুত্তে** অজিতের নামোল্লেখ না থাকলেও এইরূপ মতবাদ অব্রহ্মচর্যবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর এই মতবাদ জড়বাদী বৃহস্পতি ও চার্বাকের 'লোকায়ত' দর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আচার্য বুদ্ধঘোস তাঁর টীকাগ্রন্থে (**দীঘ ও মজ্‌ঝিমনিকায়ে** অট্ঠকথা) এই নামটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। অজিত ছিল তাঁর ব্যক্তিগত নাম। মনুষ্যকেশের দ্বারা নির্মিত কম্বল পরিধান করতেন বলে তিনি কেশকম্বল বা কেশকম্বলী নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অঞ্জনবন—এটি কোসলের রাজধানী সাকেতের উপকণ্ঠে একটি বিস্তৃত স্বয়ংজাত বনবিশেষ। এখানকার মৃগোদ্যানে (মিগদাব) বুদ্ধ অনেকদিন অতিবাহিত করেন এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সাকেত-জাতক, সাকেত-সুত্ত, জরাসুত্ত প্রভৃতি কয়েকটি সূত্র দেশনা করেন। কাজল-বর্ণের ফুলে ভরা অঞ্জন লতাগাছের প্রাচুর্যহেতু এই অরণ্যটিকে অঞ্জনবন বলা হত। অধ্যাপক হারাণ চন্দ্র চাকলাদারের মতে এই অঞ্জনবনটি বোধ হয় সংযুক্ত ও **অঙ্গুত্তর নিকায়** গ্রন্থে (সাকেত নগরের নিকটবর্তী) অপর নাম কালকারাম বলে অভিহিত হয়েছে। তিনি

আরও মনে করেন, বসিষ্ঠ, বৌধায়ন (তাঁদের ধর্মসূত্রে) আর্যাবর্তের পূর্বসীমানায় অবস্থিত প্রয়াগের (অর্থাৎ মানবধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত মধ্যদেশের পূর্বসীমা) সন্নিহিত 'কালকবন' নামে যে বিস্তীর্ণ অরণ্যের উল্লেখ করেছেন, ঐ কালকবনই পালি সাহিত্যে 'কালকারাম' নামে উল্লিখিত হয়েছে। 'অঞ্জন' ও 'কালক' শব্দ দুইটি কৃষ্ণবর্ণার্থক এবং সাকেত নগরটিও প্রয়াগের মধ্যরেখা থেকে খুব বেশী দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত ছিল না। সুতরাং তাঁর মতে কালকবন, অঞ্জনবন ও কালকারাম একত্বজ্ঞাপক অভিন্ন বনকেই বোঝাচ্ছে (*Aryan Occupation of Eastern India*, পৃ, ৭-৯). স্বর্গীয় চাকলাদার মহাশয় সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের বিভিন্ন সূত্র-মাধ্যমে এবিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এ-প্রসঙ্গে আরও মনে করা যেতে পারে, যে সাকেত-অঞ্চল থেকে প্রয়াগ-অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির বিভিন্ন অংশ অঞ্জনবন, কালকারাম, কালকবন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অঞ্ঞমঞ্ঞপচ্চয় (অন্যোন্য প্রত্যয়)—**অভিধম্মপিটকের** সপ্তম গ্রন্থ **পট্ঠানের 'পচ্চয় নিদ্দেস'** অংশে চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় বা কার্যকারণ সম্পর্কের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ নির্দেশিত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের সর্বোচ্চ জ্ঞান এই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের ব্যাখ্যায় রূপায়িত বলে মনে করা হয়। সুতরাং তদনুসারে মনে করা যেতে পারে যে বুদ্ধের ধর্মের আভিধার্মিক ব্যাখ্যার সর্বশেষ বিকাশ প্রত্যয় ধারণার মধ্যেই পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষের মতে কোন বস্তু বা চিত্ত যখন অপ্রত্যক্ষভাবে অন্য কোন বস্তু বা চিত্তের উৎপত্তি বা স্থিতির সহায়তা করে তাই প্রত্যয় (যং পটিচ্চ ফলং এতি সো পচ্চয়ো অপ্পচ্চকথায় নং বত্তীতি অত্থো)। প্রথমোক্ত বস্তুকে বলা হয় প্রত্যয় ধর্ম এবং পরবর্তীকে বলা হয় প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তখন বীজ হচ্ছে প্রত্যয় ধর্ম, আর অঙ্কুর হচ্ছে প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম। বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপত্তির মধ্যে বীজ হচ্ছে মূল বা হেতুপ্রত্যয়, আর মাটি, উত্তাপ ইত্যাদি সহায়ক বস্তুগুলি অন্য প্রকার প্রত্যয়। তেমনি প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে উত্তাপ বা আগুন হচ্ছে হেতু। কারণ, হেতু, নিদান ইত্যাদি হচ্ছে প্রতিশব্দ। **'পট্ঠান'** গ্রন্থে প্রধানতঃ কুশল, অকুশল ইত্যাদি চিত্তোৎপত্তির চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে।

পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কযুক্ত প্রত্যয়কে বলা হয় অন্যোন্য প্রত্যয়। বুদ্ধঘোষ এর একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনটি দণ্ড যেমন পরস্পরের সাহায্যে দণ্ডায়মান থাকে, একটি দণ্ড পতিত হলে অপর দুটিও পতিত হয় (অঞ্ঞমঞ্ঞং উপ্পাদনূপত্থম্ভনভাবেন উপকারকো ধম্মো অঞ্ঞমঞ্ঞপচ্চয়ো, অঞ্ঞমঞ্ঞূপত্থম্ভকং তিদণ্ডকংবিয়) তেমনি প্রতিসন্ধিক্ষণে নাম ও রূপ, চার মহাভূত অথবা চিত্ত-চৈতসিক পরস্পরের উৎপত্তি ও স্থিতির সহায়তা করে। অন্যোন্য প্রত্যয়সকল সহজাত কিন্তু সকল সহজাত প্রত্যয় অন্যোন্য নয় (**বিসুদ্ধিমগ্গ**, পৃ. ৫৩৫)।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞ—

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষু ইনি। তিনি বুদ্ধদেবের অতীব অন্তরঙ্গ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব খুব সুন্দরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলে ভগবান বুদ্ধ তাঁকে প্রশংসা করে উক্ত নামে অভিহিত করেন। এঁর পূর্ব নাম ছিল কোণ্ডঞ্ঞ। তিনি

কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী দ্রোণবাস্তুতে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে বুদ্ধের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ধম্মচক্কপবত্তনসুত্ত প্রচারের পাঁচদিন পরে যখন অনত্তলক্খণ সুত্ত প্রচারিত হয়েছিল তখন অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞ অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। বুদ্ধ তাঁকেই প্রথম 'এহি ভিক্খু' বলে সম্বোধন করে প্রথম উপসম্পদা দান করেন এবং পরে তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। প্রধান শিষ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে ছদ্দন্ত বনে মন্দাকিনীর তীরে বার বছর বাস করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। থেরগাথাতে আমরা কোণ্ডঞ্ঞ-এর নাম পাই। তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বহু গাথাও রচনা করেছিলেন।

দ্রঃ *PPN* 1, p. 43 ; **বিনয়** ১ম, পৃ. ১৩-১৪। বেলা ভট্টাচার্য

অট্ঠকনাগর সুত্ত—

পালি-সাহিত্যের **মজ্ঝিম-নিকায়** এবং **অঙ্গুত্তর নিকায়ে** (৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২-৩৫৭) অট্ঠকনাগর সুত্ত নামে দুটি সূত্র সংকলিত দৃষ্ট। **মজ্ঝিম-নিকায়ে** বাহান্ন-সংখ্যক সূত্রটি বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ কর্তৃক বেসালীর (বৈশালী) বেলুব গ্রামে অবস্থানকালে দসম (দশম) নামক এক গৃহপতির অনুরোধে ভাষিত।

আসবক্ষয় হেতু চিত্তের বিমুক্তি তথা অনুত্তর যোগক্ষেম পদ-পাপ্তির উপায় সমূহ জিজ্ঞাসু হলে উপদেশচ্ছলে এই সূত্রটির অবতারণা। আনন্দ এই সূত্রে এগার প্রকার পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে চারটি রূপধ্যান-বিষয়ক, চারটি ব্রহ্ম-বিহার বিষয়ক এবং অবশিষ্ট তিনটি অরূপ-ধ্যান-বিষয়ক। এদের যে কোন একটি পথের অনুসরণ করে মানুষ কুশল চৈতসিকধর্ম সম্পন্ন হয় এবং ক্রমে আসব-পরিক্ষয়ে অনুত্তর যোগ-ক্ষেমতা প্রাপ্ত হয়। ন্যূনপক্ষে পঞ্চনীবরণের ক্ষয়-হেতু শুদ্ধাবাস দেবলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়।

অঙ্গুত্তর-নিকায়ে (৫ম, পৃ. ৩২৮-৫৮) **অনুসসতিবগ্গে**ও এই সূত্রটি দৃষ্ট। বিষয়বস্তুর কোন ভিন্নতা নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

Encyclopaedia of Buddhism, **Vol. II ; Fascicle 2. p. 334.**
PPN **I. p. 46.**

সাধন সরকার

অট্ঠ-বিমোক্খ—

(সং, অষ্ট-বিমোক্ষ)। বিমোক্খ বা বিমোক্ষ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিমুক্তি। উচ্চতর সমাপত্তিসমূহের আবরণ উন্মোচিত করে বলেই এর নাম বিমোক্ষ। অথবা বাহ্যজগতবিমুখ হয়ে অন্তর্মুখী হয় বলে বিমোক্ষ। অথবা সর্বসংস্কার-বৈমুখ্যহেতু বিমোক্ষ। সর্বসংস্কার থেকে বিমুক্তি বা বিমোক্ষ আট প্রকার, যথা—১। যোগী নিজের এবং অপর সকলের রূপ দর্শন করে রূপ যে পরিণামে অশুভ এবং শূন্য এই জ্ঞান লাভ করেন এবং রূপ অমনোজ্ঞ বলে রূপের প্রতি অনাসক্ত হন। এটা প্রথম বিমোক্ষ। ২। নিজে রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে অপর সকলের রূপের পরিণাম চিন্তা করেন। সকলের রূপ যে পরিণামে অশুভ এবং শূন্য এই জ্ঞান লাভ করেন। এটা দ্বিতীয় বিমোক্ষ। ৩। দশ দিকের সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সহগতচিত্ত হয়ে যোগী অবস্থান

করলে সমস্ত প্রাণী তাঁর অপ্রতিকূল হয়—এরূপ শুভতেই অধিমুক্ত হয়। এটা তৃতীয় বিমোক্ষ। ৪। সর্বপ্রকারে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে প্রতিঘ (=ক্রোধ) সংজ্ঞাসমূহ দূরীভূত করতঃ নানাত্ব সংজ্ঞাসমূহে মনোযোগী না হয়ে "অনন্ত আকাশ" এইরূপ চিন্তা করে আকাশানন্তায়তন (ধ্যান) প্রাপ্ত হয়ে যোগী বিহার করেন। এটা চতুর্থ বিমোক্ষ। ৫। সর্বপ্রকারে আকাশানন্তায়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এরূপ চিন্তা করতঃ বিজ্ঞানানন্তায়তন প্রাপ্ত হয়ে যোগী বিহার করেন। এটা পঞ্চম বিমোক্ষ। ৬। সর্বপ্রকারে বিজ্ঞানানন্তায়তন অতিক্রম করতঃ "কিছুই নেই" এরূপ চিন্তা করে আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত হয়ে যোগী বিহার করেন। এটা হচ্ছে ষষ্ঠ বিমোক্ষ। ৭। সর্বপ্রকারে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে—"সংজ্ঞাও নেই অসংজ্ঞাও নেই (অর্থাৎ স্থূল সংজ্ঞা নেই বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম সংজ্ঞা আছে)" এরূপ চিন্তা করে **নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন** প্রাপ্ত হয়ে যোগী বিহার করেন। এটা সপ্তম বিমোক্ষ। ৮। সর্বপ্রকারে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ (অর্থাৎ বস্তু-বিষয়ের সংজ্ঞা ও অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হওয়া) অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যোগী অবস্থান করেন। এটা অষ্টম বিমোক্ষ। এই অষ্টম বিমোক্ষ অবস্থায় চতুর্বিধ অরূপস্কন্ধের (সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞান) একটুও বিদ্যমান থাকে না। এই অবস্থাতে যোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসও সম্পূর্ণরূপে সাময়িক নিরুদ্ধ হয় বলে যোগীকে মৃতবৎ মনে হয়। কিন্তু যথাকালে যোগী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। কেবলমাত্র আর্য-পুদ্গলরাই এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হতে সমর্থ। লোকোত্তর মার্গ-ফলের মধ্যে এটাই শেষ ফল এবং এটা প্রাপ্ত হলে ইহজন্মেই নির্বাণ-প্রাপ্তি ঘটে বলে এটাকেই সর্বোত্তম বিমোক্ষ বলা হয়েছে। (**দীঘনিকায়,** ২য়, পৃ. ৭০—৭১ ; **মজ্ঝিমনিকায়,** ২য়, পৃ. ১২—১৩ ; **অভিধর্মকোশ**, অষ্টম, কারিকা ৩২—৩৪)।

সুকোমল চৌধুরী

অট্ঠিকসুত্ত—

অট্ঠিকসুত্ত বা **অট্ঠিকমহপ্ফলসুত্ত** পালি ত্রিপিটক (তিপিটক) সাহিত্যের অন্তর্গত **সুত্তপিটকের সংযুক্ত-নিকায়ের** মহাবর্গস্থিত (মহাবগ্গ) বোধ্যঙ্গসংযুক্তের একগুচ্ছ সূত্র (সংখ্যা ৫৭—৬২), এই সূত্রগুলিতে অট্ঠি অর্থাৎ অস্থি বা নরকঙ্কাল বিষয়ক ধ্যানের দ্বারা বোধ্যঙ্গ (বোজ্ঝঙ্গ) ফললাভ আনিশংসোর উপায় বর্ণিত হয়েছে। অস্থি বা নরকঙ্কালকে ধ্যানের বিষয় করে **অঞ্ঞতরফলসুত্ত, মহত্থসুত্ত, যোগক্খেম সুত্ত, সংবেগ সুত্ত ও ফাসুবিহার সুত্তগুলি** ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক আলোচিত ও উপদিষ্ট হয়েছে। এই সব সূত্রে অস্থিই ধ্যানের স্মৃতি-বোধ্যঙ্গের বিষয়বস্তু এবং তার সাহায্যেই উপেক্ষা-বোধ্যঙ্গের মহাফলে উপনীত হওয়া যায়। অনাগামিত্ব, যোগক্ষেমপদ, মহাসংবেগ প্রভৃতি আরামপ্রদজীবন ধারা (ফাসুবিহারতা) অস্থি-বিষয়ক উপেক্ষা-বোধ্যঙ্গ চিন্তনের দ্বারা যে লাভ করা যায় ছয়টি সূত্রের সাহায্যে তা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। অস্থিকেন্দ্রিক ধ্যান-সাধনায় **ইহজীবনে** অঞ্ঞা বা অনুত্তর জ্ঞান লব্ধ হয়।

দ্রষ্টব্য : *PPN*, I, p. 49.

সাধন সরকার

অড্ঢকাসী—তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায়নি। কাশীর এই নগরশোভিনী কাশীর অর্ধ সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। এ জন্য 'অড্ঢকাসী' নামে অভিহিত হয়েছেন। তিনি বারাণসীর এক ধনী ও খ্যাতনামা নাগরিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরমা সুন্দরী ও বহু গুণময়ী ছিলেন। কিন্তু অতীত জন্মের বাচনিক দুষ্কৃতির জন্য তিনি

রাজগৃহের নগরশোভিকায় পরিণত হন। ভগবান কস্সপ বুদ্ধের সময়ে তিনি দেশনায় পারদর্শিনী ভিক্ষুণী ছিলেন। একদা একজন অর্হত্ব প্রাপ্তা ভিক্ষুণীকে 'গণিকা' বলে অভিহিত করায় পরে তাঁকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। অড্‌ঢকাসী তাঁর অনুরাগীদের কাছে এক রাত্রির দক্ষিণা স্বরূপ পাঁচ শত মুদ্রা দাবী করতেন। বুদ্ধঘোষের মতে 'কাসী' অর্থ এক হাজার এবং যা কিছু হাজার মূল্যের তাকে 'কাসিয়া' বলা হত। এজন্যই তাঁর নাম হয়েছে অড্‌ঢকাসী। ধর্মপালের মতে (**পরমত্থদীপনী**, পৃ. ৩২) রাজা কাশীরাজ্য হতে একদিনে এক হাজার মুদ্রা খাজনা সংগ্রহ করতেন। অনুরূপ মুদ্রা অড্‌ঢকাসীর অনুরাগীরা তাঁর সঙ্গে এক রজনী যাপনের জন্য ব্যয় করতেন। **থেরীগাথার** একটি শ্লোকেও উল্লেখিত হয়েছে— যতখানি কাশীজনপদ তিনি তত সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন (গাথা নং ২৫)। এজন্য তাঁর নাম হয় 'কাসী'। কিন্তু পরে অনেকে প্রতি রজনীতে এক হাজার মুদ্রা ব্যয় করতে অসমর্থ হওয়ায় অর্ধেক মুদ্রা প্রদান করে তাঁর সাহচর্যে দিবা যাপন করত। এজন্য তাঁর নাম হয়েছে 'অড্‌ঢকাসী'। অড্‌ঢকাসী বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করেন। উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বুদ্ধের দর্শনার্থী হয়ে শ্রাবস্তীর দিকে রওনা করেন। কিন্তু দুর্বৃত্তদের জন্য আর অগ্রসর হতে অসমর্থ হন। নিরুপায় হয়ে এক ব্যক্তিকে তিনি বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন এবং ভগবানের আদেশ প্রার্থনা করেন। ভগবান অন্য ব্যক্তি মারফতে তাঁকে ভিক্ষুণী পর্যায়ে উন্নীত হবার আদেশ প্রদান করেন। (**অপদান**, ২য়, পৃ. ৬১০-১১ ; **পরমত্থদীপনী**, পৃ. ৩০) এই ঘটনাটি পরে একটি প্রথায় পর্যবসিত হয় (**সমন্তপাসাদিকা**, ১ম পৃ. ২৪২)।

থেরীগাথায় তাঁর নামে ২টি (গাথা সং, ২৫, ২৬) গাথা আছে। প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনকে বোঝার জন্য **থেরীগাথার** মণিমঞ্জুষায় সংরক্ষিত শ্লোক ছন্দে রচিত এই গাথা দু'টির অবদান কম নয়।

আশা দাশ

অতীশ

অতীশ পূর্ব ভারতের বিক্রমপুরে ৯৮২ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা কল্যাণশ্রী এবং মাতা ছিলেন শ্রীপ্রভাবতী। তাঁর ছেলেবেলার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি বৌদ্ধ আচার্য জেতারির শিষ্য ছিলেন। তাঁর কথায় তিনি নালন্দায় এসে বিহারের অধ্যক্ষ বোধিভদ্রের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি নাম নিয়েছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি বিক্রমশীল বিহারের বিখ্যাত পণ্ডিত নরোপার (নাড়পাদ) নিকট যোগশাস্ত্র পড়েছিলেন। তিনি ভিক্ষু হয়ে বিক্রমশীল বিহারে থাকতেন। সেখানে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই প্রধান পণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি একত্রিশ বছর বয়সে ত্রিপিটকে, তন্ত্রে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর বৌদ্ধশাস্ত্রের সূত্রে, বিনয়ে, অভিধর্মে, প্রজ্ঞাপারমিতায়, ন্যায়ে ও দর্শনে এবং গুহ্যবিদ্যা ও সিদ্ধাচার্যদের যোগতন্ত্রে খুব জ্ঞান ছিল। তিনি সুবর্ণদ্বীপে ১০১২ খৃষ্টাব্দে গিয়ে সুবর্ণদ্বীপের আচার্য ধর্মপালের বা ধর্মকীর্তির বা চন্দ্রকীর্তির নিকট অসঙ্গের অভিসময়ালংকার, শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার এবং আরো অনেক শাস্ত্র পড়েন। তিনি বারো বছর পর সুবর্ণদ্বীপ হতে বিক্রমশীল মহাবিহারে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরেই গৌড়-মগধ-বঙ্গের রাজা নয়পাল তাঁকে বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে বসান। তিনি যখন অধ্যক্ষ ছিলেন তখন বিক্রমশীল মহাবিহারের নাম ভারতে এবং বহির্ভারতে খুবই ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিব্বতের রাজা তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আসতে অনুরোধ করে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে যেতে না চাইলেও তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের খারাপ অবস্থা বুঝে বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ আচার্য সম্বস্থবির রত্নাকরপ্রভের মত নিয়ে এবং তাঁকে ফিরে আসার কথা জানিয়ে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় আচার্যদের সঙ্গে ওখানে গেছলেন। আচার্য রত্নাকর তাঁদের বলেছিলেন "অতীশ না থাকলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বহু বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের চাবি তাঁরই হাতে ; তাঁর অনুপস্থিতিতে এসব প্রতিষ্ঠান শূন্য হয়ে যাবে।......তবু, আশীর্বাদ করছি, তুমি, অতীশ ও তোমাদের সঙ্গীদের নিয়ে দেশে ফিরে যাও, সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য অতীশের সেবা ও কর্ম লাগুক।" তিব্বতে পৌঁছিলে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে খুবই অভ্যর্থনা জানান হয়। তিনি তিব্বতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর তিব্বতে আসার পর সেখানকার বৌদ্ধধর্মের খুবই প্রসার হয়েছিল। তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘে যে সংস্কার করেছিলেন তারই ফলে তিব্বতে কদম-পা সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল। পরে ইহা গেলুগ-পা (হলুদ) সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত হয়েছিল। ধীরে ধীরে আরও বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

তিব্বতীরা তিব্বতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পৌঁছান কালকে 'জাগৃতির যুগ' বলে মনে করে। তিব্বতে তাঁর আসা থেকে সেখানে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় এই তের বছর কাল (১০৪২-৫৪ খৃষ্টাব্দ) তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের এবং সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তিব্বতীরা দীপঙ্করকে জো-বো-অতীশ বা জো-বো মর্-মে জোর বলে শ্রদ্ধা জানায়। জো-বো শব্দের মানে হচ্ছে স্বামী (প্রভু)। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্ধ ভোট সাহিত্যের রচনা, পুরোনো অনূদিত বইয়ের আবার অনুবাদ এবং অনেক বইয়ের অনুবাদ করতে ভোট্টলোচাবা ও পণ্ডিতদের সাহস জুগিয়েছিলেন। তাঁর কাল ভোটসাহিত্যে এক নতুন যুগের আরম্ভ করেছিল। অনেকে এখনও মনে করেন যে তিব্বতীয়দের যা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এর সব কিছুর মূলেই রয়েছে তাঁর দান। তিনি ৭৩ বছর বয়সে ১০৫০-১০৫৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের নে-থানের তারা মন্দিরে মারা যান।

দেবগে ও স্তহর-থঙ্ সংস্করণের **তঞ্জুরে** দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে গ্রন্থগুলি রচনা ও অনুবাদ করেছেন তাতে কোথাও কোথাও মতভেদ দেখা যায়। অস্টিন ওয়াডেলের মতে ২০টি, নির্মল সিংহের মতে ২৩টি এবং অলকা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ৭৯টি ; এর মধ্যে ৩৪খানি গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর নিজের রচনা। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গ্রন্থ হচ্ছেঃ বোধি-পথ-প্রদীপ, চর্যাসংগ্রহ-প্রদীপ, সত্যদ্বয়াবতার, মধ্যমোপদেশ, সংগ্রহ-গর্ভ, হৃদয়-নিশ্চিত, বোধিসত্ত্ব-মন্যাবলী, বোধিসত্ত্ব-কর্মাদি-মার্গাবতার, সরণ গতদেশ, মহাযান-পথ-সাধন বর্ণ-সংগ্রহ, মহাযান-পথ-সাধন-সংগ্রহ, সূত্রার্থ-সমুচ্চয়োপদেশ, দশকুশল-কর্মোপদেশ, কর্ম-বিভঙ্গ, সমাধি-সম্ভার-পরিবর্ত, লোকোত্তর সপ্তিক-বিধি, গুহ্যক্রিয়া-ক্রম, চিত্তোৎপাদ-সম্ভার-বিধি-ক্রম, শিক্ষা-সমুচ্চয়-অভিসময়, বিমল-রত্ন-লেখন, কায়-বাচ-চিত্ত-সুপ্রতিষ্ঠিত নাম, রত্ন-করণ্ড-উদঘাত-নাম মধ্যমকোপদেশ, সংসার-নামো-নিরয়-নিকর-নামসংগীতি ইত্যাদি। অনেকের মতে তিনি এই বইগুলিও লিখেছেনঃ কৃষ্ণ-যমারি-সাধন, প্রজ্ঞাপারমিতা-পিণ্ডার্থ-প্রদীপ, বোধিমার্গ-প্রদীপপঞ্জিকা, বোধিসত্ত্ব-চর্যাবতার-ভাষ্য, ক্রোধ-প্রজ্বল সাধন, জল-বলী-বিমল-গ্রন্থ, শ্রীহেবজ্র-সাধন-রত্ন-প্রদীপ, বজ্রাসন-বজ্রগীতি ইত্যাদি।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন হিন্দুযুগের শেষের দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি বাঙ্গালী জাতির গৌরবের টীকা। তাঁর জায়গা রয়েছে বৌদ্ধজগতের একেবারে সামনে। বুদ্ধদেবের পর বৌদ্ধজগতে দীপঙ্করের মত আর কোন লোকের জন্ম হয় নাই।

কানাইলাল হাজরা

অত্তদণ্ডসুত্ত—পালি তিপিটক (ত্রিপিটক) সাহিত্যের অন্তর্গত **সুত্তনিপাতের অট্‌ঠকবগ্‌গের** পঞ্চদশসংখ্যক সূত্র (সুত্ত)। শাক্য ও কোলিয়গণের বিবাদ নিরসনার্থে তথাগত গৌতমবুদ্ধ কর্তৃক এই সূত্রটি প্রচারিত। এই সূত্র (সুত্ত)-টি শুনে প্রায় পাঁচশ শাক্য ও কোলিয় যুব-সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজিত হন। সূত্র (সুত্ত)টিতে প্রকৃত ও আদর্শ মুনির লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যিনি জাগতিক কোন প্রকার দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়িত করেন না, যিনি সবরকম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে বিরত থাকেন, বন্ধনশূন্য, সত্যভাষী, অপ্রগল্ভ, অকপট, ক্রোধশূন্য ও লোভাতীত তিনিই প্রকৃত মুনি। আদর্শ মুনি অতন্দ্র, জড়তাশূন্য, অপ্রমাদযুক্ত, আত্মশ্লাঘাহীন এবং অহিংস হবেন। সত্যনিষ্ঠ মুনি নির্বান্ধব হন। তিনি পুরাতনকে যেমন অভিনন্দন জানান না তেমনি নূতনকেও বিচারহীন হয়ে অনুসরণ করেন না। সত্যনিষ্ঠ মুনি নষ্টবস্তুর জন্য শোকাতুর না হয়ে তৃষ্ণামুক্ত হবেন। ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে জেনে শোভনাচারী হন। আদর্শ মুনি সকলপ্রকার বন্ধনাতীত হয়ে ছিন্নস্রোতে রূপান্তরিত হন। এরূপ মুনি তৃষ্ণারহিত বলে জ্ঞানের সাহায্যে কর্ম-বিপাকের ঊর্ধ্বে থাকেন এবং পরম শান্তি অনুভব করেন। সকল বন্ধনস্রোতকে ছিন্ন করে বন্ধনমুক্তির রসাস্বাদন করেন।

দ্রষ্টব্য : *PPN*, I, p. 54.

সাধন সরকার

অত্থপটিসম্ভিদা—(সং. অর্থ-প্রতিসংবিৎ)। পালি **খুদ্দকনিকায়ের** অন্তর্গত **'পটিসম্ভিদামগ্‌গে'** বর্ণিত চার প্রকার পটিসম্ভিদার মধ্যে ইহা প্রথম পটিসম্ভিদা। পটিসম্ভিদা শব্দের অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচারক্ষম জ্ঞান। অপর তিনটি পটিসম্ভিদা হচ্ছে—ধম্ম-পটিসম্ভিদা, নিরুত্তি –" এবং পটিভাণ—"। অত্থপটিসম্ভিদার 'অত্থ' শব্দের অর্থ 'পচ্চয়সম্ভূত ফল' অর্থাৎ হেতুজাত ফল। জাত, ভূত, উৎপন্ন, প্রতীয়মান ইত্যাদির যে জ্ঞান তারই নাম অত্থ-পটিসম্ভিদা। চতুরার্যসত্যের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখ-নিরোধ হচ্ছে অত্থপটিসম্ভিদা। দুঃখ-সমুদয় এবং মার্গ হচ্ছে ধম্ম-পটিসম্ভিদা। (**বিভঙ্গ**, পৃঃ ২৯৩-২৯৫)। বুদ্ধঘোষ অবশ্য 'অত্থ' বলতে পাঁচটি বিষয়কে বুঝিয়েছেন— ১। পচ্চয়-সম্ভূত, ২। নির্বাণ, ৩। ভাষিতার্থ (বুদ্ধভাষিতের অর্থ), ৪। কর্মবিপাক এবং ৫। ক্রিয়া। এইগুলির যে জ্ঞান তাকে বলা হয়েছে 'অত্থ-পটিসম্ভিদা'। এর মধ্যে তৃতীয়টি (= ভাষিতার্থ)-ই কেবল বুদ্ধঘোষের সংযোজন। বাকী সবই বিভঙ্গের ব্যাখ্যার অন্তর্গত। যেমন, নির্বাণ = নিরোধ, ক্রিয়া এবং বিপাক = পচ্চয়সম্ভূত। প্রতিটি আর্যসত্যের তিনটি করে অবস্থা আছে। যেমন, ১। দুঃখ-সত্য, ২। দুঃখ-সত্য জ্ঞেয় এবং ৩। দুঃখ-সত্য জ্ঞাত। এভাবে চারি আর্যসত্যের ১২ প্রকার অবস্থার যে জ্ঞান তা অত্থ-পটিসম্ভিদার অন্তর্গত। তদ্রূপ ৪ স্মৃত্যুপস্থান, ৪ ঋদ্ধিপাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে 'অত্থ' শব্দ যে অর্থে বিভঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, পটিসম্ভিদামগ্‌গে ঠিক ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। উপরে বিভঙ্গে ব্যবহৃত অর্থ প্রদত্ত হয়েছে অর্থাৎ 'প্রত্যয়সম্ভূত ফল'। কিন্তু পটিসম্ভিদামগ্‌গে বস্তুগত অর্থে 'অত্থ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে সংজ্ঞার দ্বারা যে বিষয় জানা যায় তাই 'অত্থ'। অতএব 'অত্থপটিসম্ভিদা' হচ্ছে বিভিন্ন বস্তু বিষয়ে বিচারাত্মক জ্ঞান, বৈশ্লেষিক জ্ঞান। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে বলা যায়, অত্থ-পটিসম্ভিদা হচ্ছে কোন বস্তু বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান, যথাযথ জ্ঞান।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যেও মোটামুটি একই অর্থে অর্থ-প্রতিসংবিৎ (= অত্থসম্ভিদা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থ-প্রতিসংবিৎ দ্বারা বোধিসত্ত্ব অতীতে এবং ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুসমূহের বিভাগ জানতে পারেন এবং ইহাদের উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধে জানতে পারেন। ধাতু, ইন্দ্রিয়, বিষয়, সত্য, প্রতীত্য-সমুৎপাদ ইত্যাদির বিভিন্ন অর্থ জানতে পারেন

এবং তৎতৎ বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন। (১। **পটিসম্ভিদামগ্‌গ,** ১/৮৮, ২। **বিভঙ্গ,** পৃ. ২৯৩-২৯৫, ৩। **বিসুদ্ধিমগ্‌গ,** পৃ ৩৭২, ৪। **মিলিন্দপঞ্‌হ,** পৃ. ৩৩৯, ৫। **বোধিসত্ত্বভূমি,** পৃ. ১০০, ৬। **মহাযান-সূত্রালংকার,** পৃ ১৩৯, ৭। **দশভূমিকসূত্র,** পৃ. ৭৭-৭৮)।

সুকোমল চৌধুরী

অথসালিনী—(সং, অর্থশালিনী)। পালি **অভিধম্মপিটকের** প্রধান গ্রন্থ **ধম্মসঙ্গণিপকরণের** টীকা। রচয়িতা আচার্য বুদ্ধঘোষ (খৃঃ ৫ম শতক)। **মহাবংস** এবং **সাসনবংসের** বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে বুদ্ধঘোষ সিংহলে যাবার পূর্বে উত্তর ভারতের গয়াতে বসেই এই টীকাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন (**মহাবংস,** ৩৭।২২৫, **সাসনবংস,** পৃ. ৩১)। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, যদি তিনি সিংহল যাবার পূর্বেই **অথসালিনী** লিখে থাকেন তাহলে তাতে 'বিসুদ্ধিমগ্‌গ' এবং 'সমন্তপাসাদিকা'র নাম কিভাবে উল্লিখিত হল ? কারণ এই দুটি গ্রন্থ তিনি সিংহলে গিয়েই রচনা করেছিলেন। "সদ্ধম্মসংগহের' রচয়িতা ধর্ম্মকীর্ত্তি অবশ্য বলার চেষ্টা করেছেন (যদিও অস্পষ্ট) যে আচার্য বুদ্ধঘোষ সিংহল যাবার আগে গয়াতে বসেই **'ঞাণোদয়'** এবং **'অথসালিনী'** রচনা করেছিলেন। তবে সিংহলে গিয়ে **বিসুদ্ধিমগ্‌গ, সমন্তপাসাদিকা** ইত্যাদি সাতটি গ্রন্থ রচনার পরে তিনি পূর্বে লিখিত অথসালিনীকে সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত করে বর্তমান অথসালিনীকে রূপদান করেছেন (**সদ্ধম্মসংগহ,** *JPTS,* ১৮৯০, পৃ. ৫৩-৫৬)। আমাদেরও তাই মনে হয় যে, বর্তমান অথসালিনী একই সময়ের রচনা নয়। ধম্মসংগণির মূল টীকা অংশটি হয়ত বুদ্ধঘোষ গয়াতে থাকাকালীন লিখেছিলেন এবং সিংহলে গিয়ে পরপর সাতটি গ্রন্থ রচনার পরে অথসালিনীর 'নিদান কথা' অংশটি রচনা করেন এবং কিছু কিছু সংশোধন করে অথসালিনীকে বর্তমান রূপ দান করেন। কারণ নিদানকথাতে যে তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে, ভারতের গয়াতে বসে তখন ঐ সকল তথ্য পাওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ পঞ্চম শতাব্দীর ভারতবর্ষে পালি-সাহিত্যের পঠন-পাঠন প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, **অথসালিনীর** সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হচ্ছে এর নিদানকথা। এর সঙ্গে ধম্মসংগণির কোন সম্বন্ধ নেই। নিদানকথার সুরুতেই বুদ্ধঘোষ অভিধম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সুত্ত ও অভিধম্মের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, অভিধম্মের যাবতীয় আলোচ্য বিষয় সুত্ত থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে সুত্তে যা সংক্ষিপ্ত এবং আংশিকভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে, অভিধম্মে তা বিস্তৃত এবং বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় অভিধম্মে তিন প্রকারে বর্ণিত হয়েছে—সুত্তন্তপর্যায়, অভিধম্ম-পর্যায় এবং প্রশ্নোত্তর-পর্যায়। সেজন্য অভিধম্ম সুত্ত অপেক্ষা অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্যবহুল। অতএব অভিধম্মের বর্তমান রূপ যে বহু পরবর্তীকালে দেওয়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুদ্ধঘোষ বলেন যে, অভিধম্মের মূল 'মাতিকা' অংশটি বুদ্ধ-ভাষিত এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই তবে মাতিকা অংশগুলিকে বিস্তৃত করে বর্তমান রূপ দিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের শিষ্যগণ'। অভিধম্মের কথাবত্থু প্রভৃতি নিয়ে অনেক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। বুদ্ধঘোষ সবই নিদানকথাতে বর্ণনা করেছেন। কথাবত্থু অশোক-সঙ্গীতির সময় সঙ্কলিত হয়। কারণ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তী দুই শত বছরে তাঁর ধর্ম-বাণী নিয়ে যে সমস্ত বুদ্ধ-ধর্ম-বহির্ভূত মতবাদ সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোকে খণ্ডন করতে গিয়েই কথাবত্থু সঙ্কলিত হয়েছে। তবে এরূপ ঘটনা যে ঘটবে তা স্বয়ং বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলে গিয়েছিলেন এবং কথাবত্থুরও 'মাতিকা' দিয়ে গিয়েছিলেন। অশোক-সঙ্গীতির সময় সঙ্গীতির সভাপতি

স্থবির মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স ঐ মাতিকাকেই ভিত্তি করে কথাবত্থু সঙ্কলিত করেছিলেন। সেজন্য কথাবত্থুও বুদ্ধবচনরূপে স্বীকৃতি পেয়ে অভিধম্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতএব, কথাবত্থুকে নিয়ে বর্তমান অভিধম্ম পিটকে সাতটি গ্রন্থ, যথা—ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক এবং পট্‌ঠান।

এর পরে আছে **সুত্তপিটকের দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়** ইত্যাদির নামকরণের বৈশিষ্ট্য। **দীঘনিকায়ের** সুত্তসংখ্যা ৩৪, **মজ্ঝিমনিকায়ের** ১৫২, **সংযুক্তনিকায়ের** ৭৭৬২ **অঙ্গুত্তরনিকায়ের** ৯৫৫৭। খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থসংখ্যা ১৫টি। এ ছাড়া বিনয়পিটক এবং অভিধম্মপিটকের নামকরণের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্র বুদ্ধবচনকে এভাবে তিনটি পিটকের অন্তর্গত করা হয়েছে—**সুত্তপিটক, বিনয়পিটক** এবং **অভিধম্ম-পিটক**। 'পিটক' কথাটি কেন সংযোজিত হয়েছে বুদ্ধঘোষ তাও যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন। পিটক আকারে ভাগ করার আগে বুদ্ধবচন নয়টি অঙ্গে বিভক্ত ছিল—যেমন, সুত্ত, গেয্য, গাথা, ব্যাকরণ ইত্যাদি। এছাড়া সমগ্র বুদ্ধবচনকে স্কন্ধাকারে ভাগ করে চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধে বিভক্ত করা হয়েছে।

অভিধম্মের উৎপত্তি কথা বলতে গিয়ে আচার্য বুদ্ধঘোষ সুমেধ তাপস রূপে বুদ্ধের জন্ম-বৃত্তান্ত থেকে সুরু করে গয়ায় বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভের পরে তাবতিংস স্বর্গে বুদ্ধ কর্তৃক প্রথম অভিধম্ম-দেশনা ইত্যাদি ঘটনা আনুপূর্বিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর এই অভিধম্ম কিভাবে আচার্য পরম্পরায় মুখে মুখে রক্ষিত থেকে অবশেষে সিংহলে গ্রন্থাকারে রূপ পরিগ্রহ করে ইত্যাদি বর্ণনা দিয়েছেন।

নিদানকথার পরেই ধম্মসংগণির টীকা আরম্ভ হয়েছে। এই অংশে ধম্মসংগণিতে প্রদত্ত প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ধম্মসংগণিতে যেমন চারিটি অধ্যায়, এখানেও চারিটি অধ্যায় যেমন, চিত্তুপ্পাদকণ্ড, রূপকণ্ড, নিক্খেপকণ্ড এবং অট্‌ঠকথাকণ্ড। প্রথম অধ্যায়ে আছে—কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত হিসেবে চিত্ত ও চৈতসিক ধর্মসমূহের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে রূপ সমূহের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে প্রথম দুটি অধ্যায়ে আলোচিত ধর্মসমূহের সারাংশ। চতুর্থ অধ্যায়কে মূলতঃ তৃতীয় অধ্যায়েরই টীকা বলা যেতে পারে। **অত্থসালিনী**, *PTS*, 1897. *Expositor*, I & II.

সুকোমল চৌধুরী

অত্থিপচ্চয় (অস্তিপ্রত্যয়)—ইহা **পট্‌ঠান**গ্রন্থে উল্লিখিত চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের মধ্যে একবিংশতিতম প্রত্যয়। অস্তিপ্রত্যয় (relation of co-presence as causal factor) নামকরণের কারণ হচ্ছে এখানে প্রত্যয়ধর্ম সহজাত অথবা পূর্বজাত হয়ে অস্তি বা বিদ্যমানতার কারণে প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মে উৎপত্তি-স্থিতির পরিপোষণ করে (পচ্চুপ্পন্নলক্খণেন অত্থিভাবেন তাদিসস্সে'ব ধম্মস্স উপত্থম্ভকত্তেন উপকারকো ধম্মো অত্থিপচ্চয়ো **বিসুদ্ধিমগ্‌গ**, পৃ. ৫৪০)। পূর্বজাত প্রত্যয়ে (যথা চক্ষুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চক্ষুর অস্তিত্ব) সহজাত-পশ্চাজ্জাত-রূপজীবিতেন্দ্রিয়-কবলীকৃত-আহার-প্রত্যয়াদির মধ্যে যে 'অস্তিভাব' আছে তাই অস্তি প্রত্যয়। অন্যোন্য এবং সন্তুতি এই দুই আকারেই অস্তিপ্রত্যয় হয়। চার মহাভূতের মধ্যে যে অস্তিভাব তা অন্যোন্য এবং মহাভূতের সঙ্গে ভূতোৎপন্নরূপের হল সন্তুতিভাব।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অধিকরণসমথা ধম্মা—ভিক্খু বা ভিক্খুনী **পাতিমোক্খের** অষ্টম বিভাগটির এইরূপ নামকরণ দেখা যায়। অধিকরণ শব্দের অর্থ বিবাদ-বিসংবাদ; কলহের বিষয়; বিচার বিষয়; অভিযোগ বা অভিযোগের বিষয়। চুলবগ্‌গে চার প্রকার অধিকরণ সম্বন্ধে এইরূপ তথ্য পাওয়া যায়। যথা—(১) বিবাদাধিকরণ—অর্থাৎ পরস্পর মতভেদে যে বিবাদের বিষয় উপস্থিত হয়; (২) অনুবাদাধিকরণ—অপবাদ বা নিন্দা, পুনঃ পুনঃ তারই উল্লেখ এবং তাতেই উৎসাহ দেওয়া হেতু যে গণ্ডগোলের বিষয় উপস্থিত হয়; (৩) আপত্তাধিকরণ—পারাজিক, সঙ্ঘাদিসেস, পাচিত্তিয়, পাটিদেসনিয়, দুক্কট, থুল্লচ্চয় ও দুব্‌ভাসিত প্রভৃতি আপত্তি (নিষিদ্ধ কার্য) করার অপরাধ সংক্রান্ত যে অভিযোগ বা অভিযোগের বিষয় উপস্থিত হয়ে থাকে; (৪) কিচ্চাধিকরণ—সঙ্ঘের কর্তব্য কার্যসম্বন্ধে যে বাদানুবাদ বা বিবাদের বিষয় আবির্ভূত হয়। সমথ শব্দের অর্থ "শান্তি", "নিষ্পত্তি", "মীমাংসা"। সুতরাং অধিকরণ-সমথ শব্দদুটির দ্বারা বোঝায় বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি, মীমাংসা, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়ার সাহায্যে গোলমালের শান্তিবিধান বা উপশম করা। এই সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ অবস্থাভেদে সাতটি প্রণালীর অন্যতমটি অবলম্বন করে মিটিয়ে ফেলা যায়। **পাতিমোক্খে** নিম্নলিখিত সাত প্রকার পদ্ধতির উল্লেখ দেখা যায়:— (১) সম্মুখ-বিনয়—ধর্ম ও বিনয়ের নীতি ও বিধান সম্মুখে রেখে সংঘ (ভিক্ষু-মণ্ডলী) এবং বিবাদী ব্যক্তি এই সকলের সমক্ষে বিচার করে বিবাদের বিষয় মীমাংসা করতে হয়। (২) সতিবিনয়—যদি কোন ভিক্ষু অসত্যভাবে অভিযুক্ত হয়ে বলেন—"আমার সম্পূর্ণ স্মরণ আছে আমি দোষ করি নাই"—তাঁর এরূপ স্মৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে যে বিচার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। (৩) অমূলহ বিনয়—(সংস্কৃত-অমূঢ় বিনয়) যে ভিক্ষুর মস্তিষ্ক পূর্বে বিকৃত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে ঐ অভিযুক্ত ভিক্ষুর মোহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁর সম্বন্ধে বিচার করে যে অধিকরণের শান্তি বিধান করা হয়, ঐ অধিকরণ শমথের নাম অমূলহ-বিনয়। (৪) পটিঞ্‌ঞায় কারেতব্বং—(সং প্রতিজ্ঞায় কর্তব্যম্) অর্থাৎ 'নিয়মানুগ স্বীকারোক্তি'—যে ভিক্ষু কৃত অপরাধ স্বীকার করেন, তাঁর সম্বন্ধে বিচার পদ্ধতি। (৫) যেভুয্যসিকা—(সং-যদ্‌ভূয়সিকা) অর্থাৎ যে অধিকরণ নিষ্পত্তি করার জন্য অধিকাংশ ধর্মবাদী ভিক্ষুর মতামত সংগ্রহ করে বিচার ও অধিকরণের মীমাংসা করা। (৬) তস্সপাপিয্যসিকা—যে দুর্দম নির্লজ্জ ভিক্ষু প্রথমে দোষ স্বীকার করে পরে অস্বীকার করে এবং এভাবে নানাভাবে সত্যের অপলাপ করবার চেষ্টা করেন, তাঁর সম্বন্ধে বিচার করার পদ্ধতি। (৭) তিণবত্থারক—(সং তৃণাবস্তারক)—কোন বিবাদের বিষয় বার বার আলোচনা করে ঘাটালে, কিম্বা মূল-অনুমূল অনুসন্ধান করলে বিবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কোন পক্ষেরই মঙ্গল হয় না; সুতরাং সংঘের মঙ্গলের জন্য তৃণদ্বারা দুর্গন্ধ মল ঢাকবার ন্যায় বিচারের বিষয়টি চাপা দিয়ে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করার পদ্ধতিকে তিণবত্থারক বলা হয়। কিন্তু পারাজিকা, সঙ্ঘাদিসেসের ন্যায় গুরুতর আপত্তির বিষয় অথবা গৃহস্থ সংশ্লিষ্ট কোন অপরাধের বিষয় এই পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয় না।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অধিচিত্ত—(=সং)। অধি + চিত্ত অর্থাৎ উন্নত চিন্তা, সম্যক্ ধ্যান, সম্যক্ সমাধি। ইহা সাধারণতঃ অধিশীল এবং অধিপ্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের তিনটি মার্গ অধিচিত্তের অন্তর্গত, যথা, সম্যক্ ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। অধিশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞার ভাবনা বা অনুধ্যানের দ্বারা যোগী দুঃখ-

সাগর উত্তীর্ণ অজর অমর পরম শান্তিময় নির্বাণসুখ উপলব্ধি করতে পারেন। (দ্র. **বিনয়পিটক**, ১।৭০, **দীঘনিকায়**, ৩।২১৯, **মজ্ঝিমনিকায়**, ১।৪৫১, **অঙ্গুত্তরনিকায়**, ১।২৫৪)।

সুকোমল চৌধুরী

অধিচ্চসমুপ্পন্নবাদ

পালি **দীঘনিকায়ের** (**দীঘনিকায়**, ১ম, ২৮-২৯) প্রথম সূত্র **ব্রহ্মজালসুত্তে** বুদ্ধকালীন যুগে জগত সংসারের উৎপত্তি তত্ত্ব নিয়ে যে বাষট্টি-প্রকার ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল অধিচ্চসমুপ্পন্নবাদ তাদের অন্যতম। অধিচ্চসমুপ্পনিকবাদীদের মতে জাগতিক সুখ, দুঃখ এবং সবকিছুই আকস্মিক ভাবে সৃষ্ট হয়। আত্মা বা জগৎ স্বয়ং উৎপন্ন হয় না অথবা অন্য কাহারও দ্বারা সৃষ্ট নয়। স্বাভাবিক ভাবেই আত্মা ও লোকের সৃষ্টি হয়—পূর্বাপর কোন কারণ সংঘটিত নয়। দুই প্রকার অধিচ্চসমুপ্পন্নবাদের কথা **ব্রহ্মজালসুত্তে** বর্ণিত। প্রথম মতে দার্শনিকগণ ধ্যানের কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্রীভূত করেন এবং ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উপলব্ধি করেন চিত্তই সমস্ত দুঃখের মূলস্বরূপ। তখন মনকে নির্বিকার স্তরে উন্নীত করে মৃত্যুর পর সংজ্ঞাতীত (অসঞ্‌ঞসত্তা) লোকে জন্মগ্রহণ করেন। এ'রা তখন অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতারূপে পরিচিত হন এবং এ'দের মধ্যে কোন কোন সত্ত্ব মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে পূর্বের জীবনকে স্মরণ করতে পারেন কিন্তু তাঁদের এই জাতিস্মরতা 'সঞ্‌ঞুপ্পাদ' স্তর অর্থাৎ অসংজ্ঞাসত্তা দেবরূপে জন্মগ্রহণের জীবনস্তর পর্যন্ত সীমিত থাকে। তাই এ'রা জগৎ ও আত্মার সৃষ্টি আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণা পোষণ করেন।

দ্বিতীয় দলের অধিচ্চসমুপ্পনিকগণ যুক্তিবিচারের দ্বারা বিশ্লেষণ ক'রে একই প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ'দের মতে মানুষের পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখ লাভের পেছনে কোন কারণ নেই। স্বভাব বা ভাগ্যবশতঃ এগুলি আকস্মিক ভাবে লভ্য।

ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত অধিচ্চসমুপ্পন্নবাদকে অজিতকেশকম্বলী কর্তৃক প্রচারিত মতবাদের সদৃশ বলে ধারণা করেন। এই মতানুযায়ী—সৎ-কর্মানুষ্ঠান অথবা নৈষ্ঠিক ধর্মীয় আচরণ দ্বারা ভাবিবাং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়।

সাধন সরকার

অধিপঞ্‌ঞা—(সং, অধিপ্রজ্ঞা) অধি + পঞ্‌ঞা, অর্থাৎ উন্নত প্রজ্ঞা। ইহা সাধারণতঃ অধিচিত্ত ও অধিশীলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম দুটি মার্গ অধিপ্রজ্ঞার অন্তর্গত, যথা, সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ সঙ্কল্প। অধিপ্রজ্ঞার দ্বারা দৃষ্টি বিশুদ্ধ না হলে যোগীর পক্ষে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এজন্য এই প্রজ্ঞাকে অধিপ্রজ্ঞা বলা হয়েছে। দ্রঃ অধিচিত্ত এবং অধিশীল। (**বিনয়পিটক**, ১।৭০ ; **দীঘনিকায়**, ১।১৭৪, ৩।২১৯ ; **অঙ্গুত্তরনিকায়**, ১।২৪০, ২।৯২, ৩।১০৬, ৪।৩৬০ ; **পটিসম্ভিদামগ্‌গ**, ১।২০, ২৫, ৪৫, ১৬৯ ; ২।১১, ২৪৪ ; **পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি**, ৬১)।

সুকোমল চৌধুরী

অধিপতিপচ্চয় (অধিপতি প্রত্যয়)—ইহা **পট্‌ঠান** গ্রন্থে উল্লিখিত তৃতীয় প্রত্যয়। যখন প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের ওপর প্রত্যয় ধর্মের প্রাধান্য সূচিত হয় তখন তাকে বলা হয় অধিপতি প্রত্যয় (জেট্‌ঠকট্‌ঠেন উপকারকো ধম্মো অধিপতিপচ্চয়ো i.e. "That state which renders service in the sense of being the chief is cause as dominant influence—*Path of Purity*, p. 637)। অধিপতি প্রত্যয় দু'প্রকার **আলম্বনাধিপতি** ও **সহজাতাধিপতি**। কোন চিত্তের উৎপাদনে যখন আলম্বনে প্রত্যয় ধর্মরূপে প্রাধান্য বা

গুরুত্ব আরোপিত হয়, তখন আলম্বনাধিপতি প্রত্যয় (object as dominant condition) হয়। আলম্বন চিত্তও হতে পারে অথবা চৈতসিকও হতে পারে। এই সম্পর্কে সৌমনস্য সহগত চিত্তগুলিই উপযোগী, কিন্তু দ্বেষ এবং মোহগত ও দৌর্মনস্য সহগত চিত্তগুলি অধিপতি প্রত্যয় হতে পারে না। আর ছন্দ (ইচ্ছা) বীর্য, চিত্ত ও বীমংসা (reflective investigation) যখন সহজাত প্রত্যয় ধর্মরূপে চিত্ত, চৈতসিক ও রূপের ওপর প্রাধান্য সূচিত করে তখন সহজাতাধিপতি প্রত্যয় হয়। কিন্তু একই সময়ে এই চারিটির মধ্যে মাত্র একটিই **অধিপতি প্রত্যয়** হতে পারে। (ছন্দবিরিয়চিত্তবীমংসাসঙ্খাতা চত্তারো ধম্মা অধিপতিপচ্চয়ো তি বেদিতব্বা, নো চ খো একতো—**বিসুদ্ধিমগ্গ**, পৃ. ৫০৪)।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অধিসীল (সং অধিশীল) অধি + সীল, অর্থাৎ উন্নত শীল, উন্নত কায়-বাক্ কর্ম। ইহা সাধারণতঃ অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের তিনটি মার্গ অধিশীলের অন্তর্গত, যথা, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম এবং সম্যক্ জীবিকা। অধিশীলে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত না হলে যোগীর পক্ষে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অধিশীলই হচ্ছে সাধনমার্গের ভিত্তিস্বরূপ। (দ্র. অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা)। (**বিনয়পিটক**, ১।৭০ ; **দীঘনিকায়**, ১।১৭৪, ৩।২১৯ ; **অঙ্গুত্তরনিকায়**, ৩।১৩৩, ৪।২৫)।

সুকোমল চৌধুরী

অনগারিক

আগারে যিনি থাকেন না তিনিই হলেন অনাগারিক। একজন অনাগারিক গৃহহীন জীবন যাপন করেন। তাঁর লক্ষ্য হল উচ্চতম শান্তিলাভ করা অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করা। এই পরম সুখ পেতে গেলে একজন ভিক্ষুকে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হবে।

মানুষ বার বার এই সংসারে আগমন করে। অজ্ঞানতাই হল এই সংসারে পুনরাগমনের কারণ। তৃষ্ণা থেকেই অজ্ঞানতার সৃষ্টি। সেজন্য এই তৃষ্ণাকে অতিক্রম করতে পারলেই একজন অনাগারিক স্তরে উপনীত হতে পারেন। শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা—এই তিনটি স্তর অতিক্রম করে, সমস্ত তৃষ্ণা ক্ষয় করে একজন ভিক্ষু এই অনাগারিক স্তরে উপনীত হতে পারেন।

একজন অনাগারিক পুনরায় তার সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। একে হীনায়াবত্তন বলে। **মজ্ঝিমনিকায়ে চুলমালুঙ্ক্যপুত্ত** সূত্রে ভিক্ষু মালুঙ্ক্যপুত্ত ভগবান বুদ্ধকে এই কথাই বলেছিলেন যে—যদি তাঁর এ প্রশ্নের অস্তি অথবা নাস্তিবাচক যে কোন একটি সঠিক উত্তর দিতে না পারেন তাহলে তিনি হীনায়াবত্তন স্তরে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবেন। অতএব অনাগারিক স্তর থেকে পুনরায় গৃহজীবনে ফিরে আসা যায়। সেখানে কোন দৃঢ় নিয়ম নেই।

দ্রষ্টব্য : *Encyclopaedia of Buddhism*, p. 509.

বেলা ভট্টাচার্য

অনঙ্গন সুত্ত

মজ্ঝিমনিকায়ের প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত একটি সূত্র। সারিপুত্র ও মোগ্গল্লানের কলঙ্কের কথা এবং তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের আলোচনা এই সূত্রে করা হয়েছে।

বেলা ভট্টাচার্য

অনত্তা (অনাত্মন্)

অনাত্মন্ শব্দের অর্থ যার মধ্যে আত্মা (পালি—অত্তা) নেই। অত্তা শব্দটি পালিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছে নিজ বা স্বীয়, যেমন—**'অত্তাহি অত্তনো নাথো'** অর্থাৎ নিজেই নিজের কর্তা, 'অত্তহিতায় পটিপন্নো ন পরহিতায়'। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে আত্মা বা দেহবহির্ভূত পরম সত্তা (soul, metaphysical entity)। অনত্তা বা অনাত্মন্ বোঝাতে অত্তা শব্দের দ্বিতীয় অর্থই সূচিত হয়। বুদ্ধ প্রায়ই বলেছেন অনিচ্চ দুক্‌খ অনত্ত অর্থাৎ সর্ব সংস্কার অনিত্য, সর্ব সংস্কার দুঃখ এবং সর্ব সংস্কার অনাত্মন্। এই তিনটিকে একত্রে ত্রিলক্ষণ বা সামান্য লক্ষণ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে, যেহেতু সমস্ত জাগতিক বস্তু বা সংস্কার অনিত্য বা পরিবর্তনশীল এবং এদের স্থায়ী অবিনশ্বর সত্তা বা আত্মা নেই, তাই এগুলি পরিণামে দুঃখদায়ক। সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই অনাত্মবাদে বিশ্বাসী। মহাযান বৌদ্ধধর্মে অনাত্মন্ শব্দের পরিবর্তে নৈরাত্ম্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের মতে নৈরাত্ম্য দু প্রকার, যথা—পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধর্ম নৈরাত্ম্য। বৌদ্ধ অনাত্মবাদ জানার জন্য অবৌদ্ধদের আত্মবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আত্মন্ শব্দের অর্থ জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা। সুষুপ্তিকালে এবং মুক্তিকালে আত্মাতে জ্ঞান থাকে না। তবে অন্য সময়ে থাকে।

বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, কৌশীতকী, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য প্রভৃতি কতকগুলি উপনিষদ্ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। ঐ সকল গ্রন্থে আত্মা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। **ছান্দোগ্য** উপনিষদের মতে মৃত্যু আমাদের জড় দেহকে বিনাশ করে। এই নশ্বর দেহ—অমৃত অশরীরী আত্মারই অধিষ্ঠান মাত্র। শরীরের সঙ্গে যুক্ত হলে ঐ আত্মা ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আত্মা দেহমুক্ত হয়ে পরমজ্যোতিরূপে স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। সেই উত্তম পুরুষ। **বৃহদারণ্যক** উপনিষদ মতে বিজ্ঞানঘন বা প্রজ্ঞানঘন আত্মা পঞ্চভূত থেকে উত্থিত হয়ে এদের সঙ্গে অনুবিনষ্ট হয়। মৃত্যুর সময় ঐ বিজ্ঞানাত্মা কর্মবশে স্বীয় গতি স্থির করে পূর্ব প্রজ্ঞা সহ বর্তমান দেহ থেকে নির্গত হয় এবং কিছু সময় অচেতন অবস্থায় অবস্থান করে। পূর্ব প্রজ্ঞা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুনির্দিষ্ট গতি অভিমুখে ধাবিত হওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে এবং পঞ্চভূতাদি দেহোপকরণগুলির দিকে আকৃষ্ট হয়ে নব দেহ পরিগ্রহ করে। ঐ আত্মাই দুই জন্মের মধ্যে সেতুস্বরূপ। ভেলসংহিতার মতে এক দেহ ত্যাগ ও অপর দেহ গ্রহণ আত্মার পক্ষে যুগপৎ সিদ্ধ হয়। অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে এটা স্বীকৃত হয়েছে আত্মার পক্ষে এই দেহান্তর গমন সম্ভব কর্মের জন্য (দ্র. **মজ্‌ঝিমনিকায়ের বঙ্গানুবাদ—মধ্যমনিকায়,** পৃ. ৩৭৩)। **ভাষাপরিচ্ছেদ** (৫০ শ্লোক) মতে আত্মার কেবল মানস প্রত্যক্ষই হয়, রূপ না থাকায় চাক্ষুষ বা ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয় না (মনোমাত্রস্য গোচরঃ)। বৈশেষিক দর্শন মতে আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। আত্মা অনুমানগম্য। আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর, জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং অসংখ্য। পরমাত্মা এক। ন্যায়মতে আত্মা প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য। নব্যন্যায় মতে জ্ঞানসুখাদি বিশেষগুণের আশ্রয়রূপে অহংপদবাচ্য আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। সাংখ্য-পাতঞ্জল মতে আত্মা নির্লিপ্ত, নির্বিকার, চৈতন্যস্বরূপ, অকর্তা, বিভু, সর্বশরীরে বিভিন্ন ও সকল চিত্তবৃত্তির সাক্ষী। অদ্বৈতবেদান্তমতে আত্মা স্বরূপতঃ নির্বিকার, নির্গুণ, অকর্তা, অভোক্তা, অদ্বিতীয় হয়েও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান (দ্রষ্টব্য, **ভারতীয় দর্শনকোষ,** ১ম, পৃ. ৩৮)।

আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসগুলি **দীঘনিকায়ে ব্রহ্মজালসুত্তে** বর্ণিত ও আলোচিত হয়েছে। উপরোক্ত আত্মবাদকে বুদ্ধ বলেছেন 'সৎকায়দৃষ্টি'—পালি—সক্কায়দিট্‌ঠি

(heresy of individuality)। **মজ্‌ঝিমনিকায়ের** চূলবেদল্ল সূত্রে তিনি বলেছেন : আত্মা রূপবান্‌, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা। আত্মা বেদনাবান্‌, আত্মায় বেদনা, বেদনায় আত্মা। "আত্মা সংজ্ঞাবান্‌, আত্মায় সংজ্ঞা, সংজ্ঞায় আত্মা। আত্মা সংস্কারবান্‌, আত্মায় সংস্কার, সংস্কারে আত্মা। আত্মা বিজ্ঞানবান্‌, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা।" এভাবে পঞ্চস্কন্ধের প্রত্যেকটীতে বা সমষ্টিগতভাবে যে চিন্তা ও বিশ্বাস, তাই সৎকায় দৃষ্টি। এমন কি "নির্বাণে আমি, নির্বাণ থেকে আমি, নির্বাণ আমার, আমিই নির্বাণ" এরূপ চিন্তা ও বিশ্বাস ও সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ (**মূলপরিয়ায় সুত্ত**)। **'অলগদ্দোপম'** সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন : এই ছয় দৃষ্টি স্থান : এই রূপ আমার, আমিই রূপ, ইহাই আমার আত্মা। এই বেদনা আমার······সংস্কার, ইহাই আমার আত্মা। যা কিছু **দৃষ্ট**, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অন্বেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত, তা'ও আমার, আমি তা', তাই আমার আত্মা। এই যে ছয় দৃষ্টিস্থান সেই লোক (জগৎ), সেই আত্মা, সেই আমি পরে হব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একই রূপ থাকব, তা'ও আমার, আমি তা', তাই আমার আত্মা।

পক্ষান্তরে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক যিনি আর্যধর্মে কোবিদ তিনি এরূপ মনে করেন না। অথচ **'ভয়ভেরব', 'মহা-অস্সপুর'** প্রভৃতি বহু সূত্রে বুদ্ধ মুক্ত কণ্ঠে জাতিস্মরজ্ঞান এবং কর্মবশে জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি স্বীকার করেছেন। কাজেই জীবগণের জন্ম-পুনর্জন্ম স্বীকার করলে আত্মার দেহান্তর গমন অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু **মহাতণ্‌হা সংখয়** সূত্রে উক্ত হয়েছে যে কৈবর্তপুত্র ভিক্ষু স্বাতি মত প্রকাশ করলেন যে ভগবান বুদ্ধের মতানুসারে কেবলমাত্র বিজ্ঞানই সংসার পথে ধাবিত হয়। বুদ্ধ তখন মত প্রকাশ করলেন যে বিজ্ঞান ও প্রতীত্য সমুৎপন্ন। কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নয়। আত্মার বা বিজ্ঞানের দেহান্তর গমন মানেন না অথচ জন্মান্তর স্বীকার করেন—এই সমস্যার মীমাংসা নিকায়ের সূত্র সমূহে পাওয়া যায় না। **'মিলিন্দ পঞ্‌হ'** গ্রন্থের মতে যেমন প্রথম তরঙ্গ নিবৃত্ত হয়ে দ্বিতীয় তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ নিবৃত্ত হয়ে তৃতীয় তরঙ্গ ওঠে, তেমনি পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে উৎপন্ন এক জীবন্ত দেহের অবসানে দ্বিতীয় ইত্যাদি দেহের আবির্ভাব হয়। ঐ দেহগুলি পরস্পর একও নয়, ভিন্নও নয়। "উহাদের উদ্ভবে আত্মার দেহান্তর গমনের প্রয়োজন হয় না। সমগ্র উদয়-বিলয় ধারার মধ্যে আত্মা বা বিজ্ঞানের অবিনশ্বরত্বের পরিবর্তে আমরা মাত্র ধর্মসন্ততি বা কর্মসন্ততি দেখতে পাই" (**মধ্যমনিকায়**, পৃ: ৩৭৩)। মহাযান দার্শনিকদের মধ্যে নাগার্জুনের মত উদ্ধৃত করা হল—নাগার্জুন বলেছেন :

> আত্মা স্কন্ধো যদি ভবেদুদয়ব্যয়ভাগ্‌ ভবেৎ।
> স্কন্ধেভ্যোঽন্যো যদি ভবেদস্কন্ধলক্ষণঃ ॥ (মধ্যমকশাস্ত্র, ১৮।১)

অর্থাৎ আত্মা যদি রূপাদি স্কন্ধের অন্তর্গত হয়, তাহলে তা' উদয় ব্যয় ধর্মী হবে। আর যদি আত্মা স্কন্ধ থেকে অন্য কিছু হয়, তবে তা অস্কন্ধ লক্ষণ হবে। অস্কন্ধ লক্ষণ অবিদ্যমান। কাজেই উহা আকাশকুসুমবৎ অসৎ।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অনন্তর পচ্চয় (অনন্তর প্রত্যয়)

ইহা **পট্‌ঠান** গ্রন্থে উল্লিখিত চতুর্থ প্রত্যয়। কার্যকারণের স্থানগত অবিচ্ছেদ্য সংলগ্নতা সম্পর্ককে অনন্তর প্রত্যয় এবং কালগত সম্পর্ককে সমনন্তর প্রত্যয় বলা হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে প্রত্যয় দুটির পার্থক্য প্রকার ভেদে নয়, গুরুত্ব (degree) ভেদে (অনন্তর ভাবেন উপকারকো ধম্মো অনন্তরপচ্চয়ো; সমনন্তরভাবেন উপকারকো ধম্মো সমনন্তরপচ্চয়ো। ······যো অনন্তর-পচ্চয়ো স্বেব সমনন্তরপচ্চয়ো—**বিসুদ্ধিমগ্‌গ**, পৃ. ৫৩৪)। ঠিক পরবর্তী অবস্থাকে অনন্তর

প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম এবং সদৃশ পূর্ববর্তী অবস্থার পুনরাবর্তনকে বলা হয় সমনন্তর প্রত্যয়োৎপন্নধর্ম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বীজ থেকে যে বৃক্ষের ক্রমবিকাশ তা'হল অনন্তর প্রত্যয় এবং পূর্ববর্তী বীজ ও পরবর্তী বীজের সম্পর্ক হল সমনন্তর প্রত্যয়। ঠিক এইভাবে কোন এক চিত্ত নিরুদ্ধ হয়ে গেলে তার অবিচ্ছেদে অন্য এক চিত্ত উৎপন্ন হয়। প্রথমটি অনন্তর প্রত্যয়ধর্ম এবং দ্বিতীয় চিত্তটি প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম। তেমনি ভবাঙ্গ চিত্তের সঙ্গে বীথিস্থ আবর্তন চিত্তের সম্পর্ক অনন্তর প্রত্যয়। চ্যুতি চিত্তের সঙ্গে প্রতিসন্ধি চিত্তের এবং প্রতিসন্ধি চিত্তের সঙ্গে ভবাঙ্গ চিত্তের সম্পর্ক অনন্তর প্রত্যয়। এইভাবে জীবের উৎপত্তিকাল থেকে অনুপধিশেষ নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত চিত্তপরম্পরা প্রবাহিত হয়ে থাকে।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অনাগতবংস

অনাগতবংস ১২৪টি শ্লোকে রচিত ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়ের জীবনী-কাব্য। **গন্ধবংসের** মতে **'মোহবিচ্ছেদনী' 'বিমতিবিচ্ছেদনী'** ও **'বুদ্ধবংসের'** লেখক ভিক্ষু কস্সপ অনাগতবংসেরও রচয়িতা। সাসনবংসদীপ মতে (শ্লোক ১২০৪) কবি চোল দেশের অধিবাসী। কাব্যটি প্রাচীন গ্রন্থের তথ্যাবলম্বনে লিখিত (Malalasekera, *Pali Literature of Ceylon*, p. 161)। এই গ্রন্থেও বুদ্ধবংসের কাব্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। ইহাকে বুদ্ধবংসের পরিপূরক গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে ভিক্ষু সারিপুত্র বুদ্ধশাসনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী হন। তাঁর অনুরোধে ভগবান বুদ্ধ ভাবীবুদ্ধ মৈত্রেয়ের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। ভাবীবুদ্ধ মৈত্রেয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী হল—তিনি ভারতের কেতুমতীতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মাবেন। তাঁর নাম হবে অজিত। সংসার জীবনে তিনি বিপুল ধনের অধিকারী হবেন। পরে চারি নিমিত্ত দর্শন করে সংসার ত্যাগ করবেন। অভিনিষ্ক্রমণের পথে হাজার হাজার নরনারী তাঁর অনুগমন করবে। তিনি বোধিবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হয়ে বোধি লাভ করবেন। মৈত্রেয় বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করবেন। তাঁর দেশিত ধর্ম শ্রবণ করে বহু ব্যক্তি জাগতিক দুঃখ পরিহার করবে। গ্রন্থটি *Journal of the Pali text Society*, **London, 1886, p. 33ff**-এ প্রকাশিত হয়েছে।

আশা দাশ

অনাগামী—'অনাগামী' শব্দের অর্থ যিনি আর এই কামধাতুর জগতে—এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবেন না। ইহা বৌদ্ধ সাধন স্তরের তৃতীয় পর্যায়। পর্যায়গুলি হল—সোতাপন্ন, সকদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব। যিনি ক্রম উন্নয়নের পথে তৃতীয় স্তরে উপনীত তিনি অর্হত্ব প্রাপ্তির বাধা স্বরূপ যে সংযোজন স্তর তা ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং অনাগামী হল চরম প্রাপ্তির সন্নিকটতম স্তর। মৃত্যুর পর অনাগামী শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের উচ্চতম স্তরে জন্মগ্রহণ করেন—তিনি আর কামধাতুর স্তরে পুনরাবর্তন করেন না। মাতৃপিতৃ সংযোগ ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তাঁর উৎপত্তি ঘটে এবং তথায় তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। কিন্তু অনাগামী কামযোগের ঊর্ধ্বে হলেও ভবযোগের অতীত নন। আসব-ক্ষয়, চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দ্বারা অভিজ্ঞা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু অনাগামী আসব মুক্ত নন এবং যথাভূতঞাণদস্সন-সম্পন্নও নন। **অঙ্গুত্তরনিকায়ে** বলা হয়েছে অনাগামী (৩য়, পৃ ৪২১) উচ্চতর স্তরে—শুদ্ধাবাস ভবে জন্ম গ্রহণ করবেন, কারণ তাঁর মৃত্যু সময়ে তিনি কামযোগ ছিন্ন করলেও ভবযোগ ছিন্ন করতে পারেননি। ছয়টি ত্রুটি অনাগামীকে বর্জন করতে হবে। তা হল—অবিশ্বাস, লজ্জাহীনতা, পাপে ভয়হীনতা, অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

মহাপরিনিব্বানসুত্তে পাওয়া যায় বুদ্ধ তাঁর কয়েকজন শিষ্যের দেহত্যাগের পর তাঁর কি গতি প্রাপ্ত হয়েছেন তা উল্লেখ করেছেন। এ'দের মধ্যে ভিক্ষুণী নন্দা, উপাসক ককুধ, কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্সহ, তুট্ঠ, সন্তুট্ঠ, প্রমুখ শিষ্যগণ পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন—কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামাস ক্ষয় করে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। এ'রা সকলেই তথায় পরিনির্বাপিত হবেন আর কামলোকে পুনরাগমন করবেন না।

আশা দাশ

অনাথপিণ্ডিক

শ্রাবস্তীর একজন ধনবান শ্রেষ্ঠী। ইনি অনাথপিণ্ডদ নামেও সুপরিচিত। ইনি ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। রাজগৃহে ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের প্রথম বর্ষে অনাথপিণ্ডিকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভগবান বুদ্ধকে জেতবন দান করে বৌদ্ধসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেছেন। সহায়সম্বলহীন অনাথকে অন্নদান করেন বলে এই শ্রেষ্ঠীর নাম অনাথপিণ্ডিক হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ তাকে সুদত্ত নামে অভিহিত করেন। অনাথপিণ্ডিকের পিতার নাম সুমন। তার পত্নীর নাম পুঞ্ঞলক্খণা (পুণ্যলক্ষণা)। অনাথপিণ্ডিকের 'কাল' নামে এক পুত্র ছিল এবং মহাসুভদ্দা (মহাসুভদ্রা), চুলসুভদ্দা (চুলসুভদ্রা) ও সুমনা নামে তিন কন্যা ছিল। তার পুত্রবধূর নাম সুজাতা। রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীর ভগিনীর সঙ্গে অনাথপিণ্ডিক পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর ভিক্ষু শিষ্যগণ তাঁর শ্যালকের গৃহে আমন্ত্রিত জানতে পেরে অনাথপিণ্ডিক ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অতিশয় উদ্গ্রীব হ'য়ে উঠলেন। সেখানে তাঁর শ্যালক বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিলেন। রজনীর গভীর অন্ধকারে ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাতের নিমিত্ত সীতবনের দিকে যাত্রা করেন। সীবক নামে এক যক্ষ আপন প্রভাবে আলোক বিতরণ করে, তখন অন্ধকার বিদূরিত হলে অনাথপিণ্ডিককে পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। সীতবনে ভগবান বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে ধর্ম দেশনা করেন। অনাথপিণ্ডিক তখন ভগবান বুদ্ধের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্রোতাপন্ন হন। পরের দিন তিনি স্বয়ং বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন এবং ভোজের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। শ্রাবস্তীতে বর্ষা ঋতু যাপনের জন্য ভগবান বুদ্ধ অনুরোধ জানালে নির্জন স্থানে বাস করার অভিলাষ প্রকাশ করেন। ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছা পূরণের জন্য নির্জন স্থান অন্বেষণ করতে গিয়ে অনাথপিণ্ডিক জেতবন ক্রয় করেন এবং ইহার মধ্যে জেতবনারাম নির্মাণ করেন। এই জেতবন অনাথপিণ্ডিক ভগবান বুদ্ধকে অর্পণ করেন এবং ভিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে প্রধান বলে খ্যাতি লাভ করেন।

ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্বেই অনাথপিণ্ডিক ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

অনাথপিণ্ডিক একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন, একজন ভিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি একজন সুবিখ্যাত বিচারকও ছিলেন। কোনও এক সময় তিনি পরিব্রাজকদের সঙ্গে বুদ্ধমতের সমর্থনে অবতীর্ণ হন এবং তর্কে জয়লাভ করেন।

দ্রষ্টব্য : **বিনয়পিটক ২য়, পৃঃ ১৫৪, অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম, পৃঃ ২৫।**

বেলা ভট্টাচার্য

অনাথপিণ্ডিকোবাদসুত্ত

মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত ১৪৩ সংখ্যক সূত্র। বৌদ্ধ ভিক্ষু সারিপুত্র, শ্রেষ্ঠী অনাথ-পিণ্ডিকের কাছে তাঁর মৃত্যুশয্যায় এই সূত্রটি প্রচার করেন। তিনি শ্রেষ্ঠীকে পার্থিব বিষয়ের

প্রতি অনাসক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। সূত্রোপদেশটি শ্রবণ করার কিছুক্ষণ পরে অনাথপিণ্ডিকের মৃত্যু হয়। পরে অনাথপিণ্ডিক দেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবতারূপেই জেতবনে এসে ভগবান বুদ্ধকে শ্রদ্ধার্পণ করেছিলেন।

বেলা ভট্টাচার্য

অনিচ্চ (অনিত্য)

অনিত্য শব্দের অর্থ যা' নিত্য বা স্থায়ী নয় (ন নিচ্চং তি অনিচ্চং, **পরমত্থমঞ্জুসা**, পৃঃ ৮২৫)। বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্র হল অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মন্। একে ত্রিলক্ষণ বা সামান্য লক্ষণ বলা হয়। এতে বুদ্ধের সমগ্র দর্শন প্রতিভাত হয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় জীব বা বস্তু অনিত্য ও সতত পরিবর্তনশীল। প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি অনুসারেও সমস্ত বস্তু কার্য-কারণসমবায়ে উৎপন্ন, সুতরাং পরিবর্তনশীল। কারণের পরিবর্তনে কার্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আপাতদৃষ্টিতে যা' স্থায়ী মনে হয় তা'ও উদয়-বিলয়শীল। বৌদ্ধমতে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ আবির্ভাব-তিরোভাবে (উদয় ব্যয়) অনিত্য ; চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-ত্বক-মন ইত্যাদি ছয় ইন্দ্রিয়ও তা'দের সংস্পর্শজনিত রূপ-শব্দাদি সবই অনিত্য। বুদ্ধ সারাজীবন এই অনিত্যের প্রচার করেছেন (সব্বে সখারা অনিচ্চা—**মজ্ঝিম-নিকায়**, ১ম ২৩০) এবং বুদ্ধের শেষ বচনই হচ্ছে বয়ধম্মা সখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ অর্থাৎ সমস্ত সংস্কারই ব্যয়ধর্মী বা বিনাশশীল, কাজেই অপ্রমাদের দ্বারা মুক্তি সম্পাদন কর। আর বলেছেন যখন কোন ব্যক্তি চক্ষু শ্রোত্র ইত্যাদিকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন তখনই তা'র সম্যক্ দৃষ্টি হয়। তাই বুদ্ধ ধম্মপদে (গাথা ২৭৭) বলেছেন ঃ

> সব্বে সংখারা অনিচ্চাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
> অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

অর্থাৎ "বিশ্বের যাবতীয় সংস্কার অনিত্য, ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করেন, তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরাগপ্রাপ্ত হন। ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।"

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অনিয়তা ধম্মা—ভিক্খু পাতিমোক্খ (ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ) গ্রন্থের তৃতীয় বিভাগটি অনিয়তা ধম্মা নামে অভিহিত। এই বিভাগের অন্তর্গত দুটি বিধি বা সূত্র হচ্ছে—যথা, (১) যদি কোন ভিক্ষু একাকী নির্জনে ব্যভিচারের উপযোগী কোন আচ্ছাদিত আসনে কোন এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসে থাকেন এবং ঐ অবস্থা যদি কোন বিশ্বস্তা উপাসিকা লক্ষ্য করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসেন এবং ভিক্ষুও স্বীকার করে থাকেন, তাহলে ঐ উপাসিকা পারাজিক, সংঘাদিশেষ বা প্রায়শ্চিত্তিক—এই তিনটির যে কোনটির দ্বারা ভিক্ষুকে অভিযুক্ত করলে, উপাসিকার বিধানানুসারে ভিক্ষু অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। (২) আচ্ছন্ন ও ব্যভিচার-যোগ্য না হলেও, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত আসনে কোন ভিক্ষুকে কোন স্ত্রীলোকের সহিত উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়ে কোন বিশ্বস্তা উপাসিকা তাঁকে সংঘাদিশেষ বা পাচিত্তিয়া আপত্তির (দোষের) যে কোনটির দ্বারা অভিযুক্ত করেন, তা'হলে উপাসিকার বিধানানুসারেই ভিক্ষুর আপত্তি (অপরাধ) ধার্য করতে হবে। 'অনিয়ত' নামটির সার্থকতা সূত্র দুইটির মর্ম থেকে সহজে বোধগম্য হয়। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে পারাজিক, সংঘাদিশেষ, পাচিত্তিয় প্রভৃতি কোন্‌টির লঙ্ঘনের দ্বারা অপরাধী ভিক্ষুকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে ঠিক করা হত। ঐ তিন প্রকার আপত্তি প্রয়োগের নিশ্চয়তা নেই বলেই এ দুটিকে অনিয়তা ধম্মা বলা হয়ে থাকে। অনিয়তো তি ন নিয়তো পারাজিকং বা

সম্মাদিসেসো বা পাচিত্তিয়ং বা' (**সুত্তবিভঙ্গ**)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে **'অনিয়তা ধম্মা'** বলে কোন বিভাগ ভিক্খুনী পাতিমোক্খের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অনুপাদ (পরিনিব্বান) সুত্ত

অনুপাদনিব্বাণসুত্ত বা **অনুপাদসুত্ত** পালি (ত্রিপিটক) সাহিত্যের **সুত্ত-পিটকের** অন্তর্গত এবং **সংযুত্তনিকায়ের মগ্‌গসংযুত্তান্তর্ভুক্ত** আটচল্লিশ সংখ্যক সূত্র (সুত্ত)। সংবদ্ধ ভিক্ষুগণকে সংজীবন যাপনের উদ্দেশ্য যে নির্বাণ ও অর্হত্ত্বাদি লাভ সে বিষয়ে সচেতন করার জন্য শ্রাবস্তীতে ভগবান গৌতম বুদ্ধ **সুত্তটি** প্রচার করেন। অন্য ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত তীর্থিকগণ কর্তৃক বৌদ্ধভিক্ষুগণের ব্রহ্মচর্য পালনের কারণ ও উদ্দেশ্য কখনও জিজ্ঞাসিত হলে ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষুগণকে প্রত্যুত্তরে জানাতে বলেন যে অনুৎপাদ (নিরাসক্ত, কারণ ও উপাদান বিহীন) পরিনির্বাণ লাভের জন্যই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ব্রহ্মচর্য জীবন-যাপন করেন। পুনর্জন্মবিহীন পরিনির্বাণ লাভের জন্য যে বিশিষ্ট পথ বা মার্গ অবলম্বন করা হয় তাই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে খ্যাত। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল—(১) সম্যক্-দৃষ্টি (সম্মা দিট্‌ঠি), (২) সম্যক্ সংকল্প (সম্মা-সংকপ্প), (৩) সম্যক্ বাক্ (সম্মা বাচা), (৪) সম্যক্ কর্ম (সম্মা-কম্মন্ত), (৫) সম্যক্ আজীব (সম্মা-আজীব), (৬) সম্যক্ ব্যায়াম বা চেষ্টা (সম্মা বায়াম), (৭) সম্যক্ স্মৃতি (সম্মা-সতি), ও (৮) সম্যক্ সমাধি (সম্মা-সমাধি)।

সাধন সরকার

অনুপিয় এটি মল্লদেশের অন্তঃপাতী একটি সহরতলি জায়গা। কপিলবস্তু থেকে রাজগৃহে যাবার পথে অবস্থিত। এখানে একটি রমণীয় আম্রবন (অনুপিয়-অম্ববন) ছিল। মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে প্রব্রজ্যা জনিত পরমানন্দে গৌতম (বুদ্ধ) সপ্তাহকাল এই আম্রবনে কাটিয়ে একদিনে (মতান্তরে সাত দিনে) ত্রিশ যোজন পথ পদব্রজে অতিক্রম করে রাজগৃহে পৌঁছেছিলেন। উত্তরকালে বুদ্ধত্ব লাভের পর এখানেই তিনি ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, মহানাম প্রভৃতি শাক্যগণকে প্রব্রজ্যা দান করেছিলেন। মল্লরা এই আম্রবনে বুদ্ধের বাসযোগ্য একটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অনুমানসুত্ত

পালি **মজ্ঝিমনিকায়ের** পঞ্চদশ সংখ্যক সূত্র। বুদ্ধশিষ্য মহামোগ্‌গল্লান কর্তৃক সুংসুমার-গিরিস্থিত ভেসকলাবনে ভগ্গজনপদের ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত। আত্মবিমর্শনের ফলাফল সম্বন্ধে ভিক্ষুগণ এই সূত্রে উপদিষ্ট হয়েছেন। নিজকর্মের গুণদোষ প্রত্যবেক্ষণ বৌদ্ধবিনয়ের মূলভিত্তি। সূত্রটিতে কীরূপে ভিক্ষুগণ দুর্বচ (অবাধ্য) হন এবং দুর্বচকারক ধর্মগুলি কী তা বিশদভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পাপ ও পাপেচ্ছার বশবর্তী হওয়া দুর্বচস্করণ ধর্ম। আত্মপ্রশংসা করা, অপরকে হেয় জ্ঞান করা, ক্রোধাভিভূত হওয়া, ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী (দুঃসাহসী) হওয়া, ক্রোধোদ্দীপ্ত বাক্য প্রয়োগ করা, হিংসাপরায়ণতা, মাৎসর্যপরায়ণতা, শঠতা, অতিমানতা প্রভৃতি দুর্বচস্করণ ধর্ম।

অপরপক্ষে সুবচস্করণী ধর্মের অনুশাসন গ্রহণ-দ্বারা ভিক্ষু সুবচনীয় হন। আত্মপ্রশংসা না করা, ক্রোধাভিভূত না হওয়া, ক্রোধোদ্দীপ্ত বাক্য প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা, অপরকে অভিযুক্ত না করা, মাৎসর্যহীনতা, অশাঠ্য, অনতিমানতা, লৌকিকমতাবলম্বিতা, দৃঢ়গ্রাহিতা প্রভৃতি সুবচস্করণধর্ম।

একজন প্রকৃত ভিক্ষু সর্বদা স্ব-বিষয়ে আত্মবিশ্লেষণ করে পাপ ও অকুশল ধর্ম পরিত্যাগে সচেষ্ট হন এবং কুশলধর্মসমূহ প্রীত প্রফুল্লচিত্তে শিক্ষা করেন—চৈতসিক সকল কর্মকে সংযত রাখেন এবং অকুশল ধর্মপ্রহীন হওয়া পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণে রত হন।

আত্মানুসন্ধানের দ্বারাই সংঘের স্থায়িত্ব, একসূত্রতা দৃঢ় হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর তাঁর টীকা-গ্রন্থে (**পপঞ্চসূদনী**, ১ম, পৃষ্ঠা ২৯৪) লিখেছেন—'পোরাণ'গণ এই সূত্রটিকে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের তুল্য বলে জানেন। আত্মবিমর্শনা ভিক্ষুগণের অন্ততঃ তিনবার করণীয় বলেও টীকাগ্রন্থে লিখিত আছে।

সাধন সরকার

অনুরাধপুর

সিংহলের কদম্ব নদীর তীরে দুই অনুরাধ নামে লোকের দ্বারা পছন্দ করা জায়গায় অনুরাধপুর গড়ে উঠেছিল এবং অনুরাধ নক্ষত্রপুঞ্জের অধীনে ছিল। সেজন্যই এর নাম হয়েছিল অনুরাধপুর (ম, ব, ১০, ৭৬, ম, ব, টী, ২৯৩)। **মহাবোধিবংস** বলে যে এখানে সন্তুষ্টমনের লোকেরা থাকতেন বলে ইহা অনুরাধপুর নামে পরিচিত হয়েছিল (ম, বো, ব, ২৯৩)। রাজা পণ্ডুকাভয় (৩৯৪-৪০৭ খৃষ্টপূর্ব) এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উপতিস্সগাম হতে তাঁর রাজধানী এখানে নিয়ে আসেন (ম, ব, ১০, ৭৫-৭৭)। তিনি অনুরাধপুরকে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। এতে ছিল নগরের জল দেবার জন্য এক বড় পুকুর, দুটি বড় হ্রদ, জয়বাপী এবং অভয়বাপী, একটি মহাশ্মশান, শিকারী এবং ঝাড়ুদারদের জন্য বিশেষ গ্রাম, বিভিন্ন দেবদেবীর জন্য মন্দির, জৈন, আজীবিক, পরিব্রাজক সন্যাসী এবং ব্রাহ্মণদের ঘর, হাসপাতাল এবং ইঞ্জিনিয়ার এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য থাকবার ঘর (ঐ, ১০, ৯৭-১০২)। পণ্ডুকাভয় এখানের দেখাশুনার জন্য দিন এবং রাত্রের 'নগর-অধিকর্তা' নিয়োগ করেছিলেন (ঐ, ১০, ৮০-১০২)। তাঁর ছেলে মুটসিব রাজধানীর ডানদিকে মহামেঘবন নামে বিখ্যাত বাগান করেছিলেন (ম, ব, ১১, ২)। ইহা ছাড়া, এখানে নন্দন বা জ্যোতিবন নামে আর এক বাগান ছিল (ঐ, ১৫, ২, ১১)।

সিংহলের পরের রাজা ছিলেন দেবানং পিয় তিস্স। তাঁরই সময়ে ভারত-সম্রাট অশোক তাঁর ছেলে মহেন্দ্রকে অনুরাধপুরে পাঠিয়েছিলেন। সিংহলী রাজা বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য অনুরাধপুরে অনেক বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (ঐ, ২০, ১৭)। অশোকের মেয়ে সঙ্ঘমিত্রা পবিত্র বোধিবৃক্ষের শাখা মহামেঘবনে লাগিয়েছিলেন। দেবানং পিয় তিস্স অনুরাধপুরে মহাবিহার, চেতিয়পব্বত, থুপারাম প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন (ঐ, ২০, ৪৮-৫০)।

চোল রাজকুমার এলার খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহল আক্রমণ করেন এবং অনুরাধপুর অধিকার করে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর শাসন করেছিলেন। এ'র হাতে বৌদ্ধধর্মের খুবই ক্ষতি হয়েছিল এবং অনুরাধপুর একেবারে ধ্বংস হয়েছিল। কাকবন্ন তিস্সের পুত্র দুট্ঠগামণি (১০১-৭৭ খৃষ্টপূর্ব) বিদেশীদের হাত হতে দেশকে উদ্ধার করেন। তিনি অনুরাধপুরে মহাস্তূপ, মরিচবট্টি, নয়তলা লৌহপ্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর ভাই সদ্ধাতিস্স সিংহাসনে বসে অনুরাধপুরে দক্ষিণগিরি বিহার নির্মাণ করেছিলেন (ম, ব, ৩৩, ৭)।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে অনুরাধপুরে পাঁচজন তামিল শাসক প্রায় চৌদ্দ বছর রাজত্ব করেছিলেন। বট্টগামণি-অভয় (২৯-১৭ খৃষ্ট পূর্ব) তামিলদের হারিয়ে অনুরাধপুর জয় করেন। তিনি ঐ নগরে অভয়গিরি বিহার করেছিলেন, (ম, ব, ৩৩, ৭৮-৮১)। বসবের রাজত্বকালে (১২৭-১৭১ খৃষ্টাব্দ) অনুরাধপুরের চারিদিকে আঠার কিউবিট উচ্চ

দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল (ঐ, ৩৫, ৯৭)। মহাসেনের রাজত্বকাল (৩৩৬-৩৬১ খৃষ্টাব্দ) ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এসময়ে এর খ্যাতি সিংহলের বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাসেন এখানে জেতবন বিহার নির্মাণ করেছিলেন (ঐ, ৩৭, ৩৮)। মহানামের সময়ে (৪০৯-৪৩১ খৃষ্টাব্দ) বিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের সিংহলী টীকাগুলি পালিভাষায় অনুবাদ করতে এখানকার মহাবিহারে এসেছিলেন (ঐ, ৩৭, ২৪৩-২৪৪)। এ সময়ে বহু বিশিষ্ট লোক বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষুদের নিকট বিদ্যালাভের জন্য এখানে আসেন।

মহানামের রাজত্বের পর ছয় জন তামিল আক্রমণকারী পঁচিশ বছরের বেশী অনুরাধপুরে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের হাতে এই দ্বীপ ছারখার হয়ে যায়। এসময়ে ধাতুসেন (৪৬০-৪৭৮ খৃষ্টাব্দ) তামিলদের মেরে সিংহলী শাসন ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি অনুরাধপুরের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছিলেন। তিনি এখানে এবং এর কাছে আঠারটি বিহার এবং পুকুর করেছিলেন। তিনি বুদ্ধের এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তি দিয়ে রাজধানীকে সাজিয়েছিলেন (ঐ, ৩৮, ৬১-৭৮)। এর কিছু পরে রাজাদের ষড়যন্ত্র এবং গৃহযুদ্ধের ফলে দেশ এক বিরাট বিপদের মুখে পড়ে। অনুরাধপুরের চারিদিকে তামিলগণ দ্বারা বারবার আক্রমণ বন্ধ করা অসম্ভব হওয়ায় নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে পোলন্নরুভ-এ নূতন রাজধানী হয়। এর পর অনুরাধপুর রাজধানী হিসাবে পরিত্যক্ত হয়।

কানাইলাল হাজরা

অনুরুদ্ধ (অনিরুদ্ধ)

শাক্য অমিতোদনের পুত্র এবং মহানামের ভ্রাতা অনুরুদ্ধ ছিলেন বুদ্ধের আত্মীয় এবং প্রধান শিষ্যদের অন্যতম। শাক্য বংশীয়দের অনেকে যখন সঙ্ঘে যোগদান করেন তখন মহানাম অভিযোগ করেন তাঁর নিজ পরিবারের কেহই সঙ্ঘে তখনও যোগদান করেননি। তিনি তাঁর ভ্রাতা অনুরুদ্ধকে বললেন আমাদের দু'জনের একজনকে গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করে সঙ্ঘে যোগদান করতে হবে। প্রথমে অনিরুদ্ধ সংসার ত্যাগে উদাসীন ছিলেন। কারণ তিনি বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত এবং নৃত্যগীতে রসাস্বাদনে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মহানামের কাছে গার্হস্থ্যজীবনের অন্তহীন পরিচর্যার বিষয় শুনে তিনি অভিনিষ্ক্রমণে সম্মত হলেন। জননীর কাছে গৃহত্যাগের সম্মতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ভদ্দীয় যদি অনুরুদ্ধের সঙ্গে গৃহত্যাগে রাজী হন তবেই সে যেতে পারে। অতঃপর এক সপ্তাহ অন্তে শাক্যনেতা ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত ও ক্ষৌরকার উপালি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। বর্ষা ঋতু অবসানের পূর্বে অনিরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করেন (বিনয়, ২য়, পৃঃ ১৮০-৩ ; মহাবস্তু, ৩য়, পৃঃ ১৭৭)। পরবর্তীকালে এই স্তরের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন (**অপদান**, ১, পৃঃ ২০)। ইনি ভগবান পদুমোত্তর সম্যক সম্বুদ্ধের সময় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে সপ্তাহকাল চীবর ও পিণ্ডপাত দান করে দিব্যচক্ষু সম্পন্ন ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান কশ্যপ বুদ্ধ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হলে তাঁর ধাতুচৈত্যের চতুর্দিকে কাংস্য-নির্মিত প্রদীপে ঘৃত পূর্ণ করে দীপমেরুরূপে জ্বালিয়ে রাখেন। তিনি নিজের মস্তকেও সহস্র সলিতাযুক্ত বৃহৎ প্রদীপ নিয়ে সমস্ত রাত্রি চৈত্য পূজা করেন। তৎপর দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখান থেকে আয়ুশেষে বারাণসীতে এক দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় অন্নভার। এই জন্মে অন্নভার ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের খাদ্য সামগ্রী প্রত্যেক বুদ্ধকে দান করেন। তাঁদের এই দানের পুণ্যাংশে সুমন শ্রেষ্ঠী ও

শ্রেষ্ঠীপত্নী দ্বিসহস্র অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করেন। এই অর্থে অন্নভার বাড়ী প্রস্তুত করতে গিয়ে মাটির নীচে নিধিকুম্ভ প্রাপ্ত হন। রাজা এই অর্থও অন্নভারকেই প্রদান করেন এবং তাঁর নামকরণ করেন 'মহাধন শ্রেষ্ঠী'। মহাধন শ্রেষ্ঠী বহু কুশল কর্ম করে দেবলোকে উৎপন্ন হন। দীর্ঘদিন দেবৈশ্বর্য পরিভোগ করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শাক্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরম সুকুমার ছিলেন। সুবর্ণ থালায় তাঁর আহার্য উৎপন্ন হত। 'নাই' (নথি) শব্দ তিনি কখনও শোনেননি। একদা তাঁর জননী পুত্রকে 'নাই' শব্দ শেখানোর জন্য একটি শূন্যপাত্র আবৃত করে অনিরুদ্ধের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথে এক দেবতা দিব্য পূপে পাত্রটি পূর্ণ করে দেন। পুত্র তা পান করে মাকে বললেন—'মা, আমি কি আপনার প্রিয় নই? এতদিন আমাকে এই সুস্বাদু নথি পূপ দেননি কেন। জননী বুঝলেন কোন দ্রব্য নেই এ সংবাদ তাঁর পুত্রের শ্রুতিগোচর হবে না (**ধম্মপদ অট্‌ঠকথা**, ১ম, পৃঃ ১১৩; ৪র্থ, পৃঃ ১২৪)। অনিরুদ্ধ ছিলেন অতি কোমল, স্নেহপ্রবণ ও সহযোগী ভিক্ষুদের প্রতি অনুগত এবং বুদ্ধের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান। ধর্মসভায় তিনি বুদ্ধের খুব কাছাকাছি অবস্থান করতেন (**বুদ্ধবংস**, ৫, পৃঃ ৬০)। কোসম্বী ভিক্ষুদের ঝগড়া বিবাদে বিরক্ত হয়ে বুদ্ধ যখন দূরে চলে যান তখন অনিরুদ্ধ, নন্দিয় ও কিম্বিল প্রমুখ ভিক্ষুগণ তাঁর মনের ভার লাঘব করেন। এই সময়ে অনিরুদ্ধের উদ্দেশ্যে **উপক্কিলেস সুত্ত** (**মজ্ঝিম**, ৩য়, পৃঃ ১৫৩) ভাষিত হয়। **নলকপান সুত্তে** (**মজ্ঝিম**, ১ম, পৃঃ ৪৬২) বহু ভিক্ষু উপস্থিত থাকলেও বুদ্ধ কেবল অনিরুদ্ধকেই প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন করেন। অনিরুদ্ধ সকলের পক্ষ হয়ে উত্তর প্রদান করেন। তিনি **অঙ্গুত্তর নিকায়ের** তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। (**দীঘ-অট্‌ঠকথা**, ১, পৃঃ ১৫) **সংযুত্ত নিকায়ে** তিনি বুদ্ধের কাছে নারীদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন (সং; ৪র্থ, পৃঃ ২৪০-৫১)। **অঙ্গুত্তর নিকায়েও** অনুরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। **অনিরুদ্ধসংযুত্ত**-এ ভিক্ষু মোগ্‌গল্লান কর্তৃক সতিপট্‌ঠান সম্পর্কে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে (সংযুত্ত, ৫, পৃঃ ২৯৪)। কোন যতি ভিক্ষু ব্রহ্মলোকে আসতে পারেন না—ব্রহ্মার এই অহঙ্কার দূর করার জন্য তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। (**সংযুত্ত**, ১ম, পৃঃ ১৪৫) কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাঁর সহ-আবাসিক ভিক্ষু অভিঞ্জিকের বহুভাষণ দোষ (সংযুত্ত, ২৩, পৃঃ ২০৩-৪) বা বাহিয়ের সঙ্ঘে বিভেদ আনয়নে বাধা দিতে পারেননি। (**অঙ্গুত্তর**, ২য়, পৃঃ ২৩৯) অনিরুদ্ধই বুদ্ধকে তাবতিংসে স্বর্গে যাওয়া জন্য অনুরোধ করেন। (**ধম্মপদ-অট্‌ঠকথা**, ৩য়, পৃঃ ৪৭১) বুদ্ধদেব তথায় এক বর্ষাবাস যাপন করে অভিধর্ম দেশনা দান করেন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে অনুরুদ্ধই পৃথিবীতে বুদ্ধের কার্যকলাপ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণ সময়ে অনিরুদ্ধ কুশিনারায় উপস্থিত ছিলেন এবং মহাপরিনির্বাণের ঠিক মুহূর্তও তাঁর জানা ছিল। এই সময়ে আনন্দ অপেক্ষা অনিরুদ্ধের বাণী অধিকতর দার্শনিক চিন্তাযুক্ত। (**দীঘনিকায়**, ২য়, পৃঃ ১৫৬-৭) ভিক্ষুদের সান্ত্বনাদান, তাঁদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে প্রেরণা দান, বুদ্ধের দেহাবশেষ নিয়ে মল্লদের সঙ্গে পরামর্শ করা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রথম সঙ্গীতিতেও তাঁর বিশেষ দান রয়েছে। সঙ্গীতির প্রাক্কালে অনিরুদ্ধই প্রথম লক্ষ্য করেন যে আনন্দ এখনও 'সেখ' পর্যায়ে রয়েছেন এবং অর্হত্ব লাভের পূর্বে তিনি প্রথম সঙ্গীতিতে গ্রহণযোগ্য নন। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে সঙ্গীতির কাজ সম্পন্ন হওয়াও সম্ভব নয়। **থেরগাথায়** তাঁর নামে কয়েকটি গাথা স্থান পেয়েছে (শ্লোক সং, ৮৯২-৯১৯)। গাথাসমূহের ৮৯২-৯০৮ শ্লোকছন্দে, ৯০৯ নং বৈতালীয় ও ঔপচ্ছন্দসক মিশ্রিত ছন্দে এবং ৯১০-১৯ নং গাথা শ্লোক ছন্দে রচিত। ভাব ও ভাষার সুষম সংযোগ গাথাগুলিকে অনুপম স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছে।

আশা দাশ

অনুসয়—(সং, অনুশয়), সহজাত প্রবণতা, চিত্তের স্বাভাবিক সুপ্তবৃত্তি যা অকুশল অনুরাগের দিকে নিয়ে যায়। আচার্য বুদ্ধঘোষের ভাষায় অদম্য চিত্তক্লেশের নামই অনুশয়। এজন্য ইহা পুনঃপুনঃ লোভদ্বেষাদি উৎপত্তির হেতু হয়। (**বিসুদ্ধিমগ্‌গো**, ২২.৬০)। আচার্য বসুবন্ধু বলেন—অনুশয় ভবোৎপত্তির মূল (মূলং ভবস্যানুশয়াঃ, **অ. কো.** ৫।১)। অনুশয় যখন আকস্মিকভাবে মনকে সমাচ্ছন্ন করে কর্ম সংঘটিত করে, তখন এর নাম হয় পর্যবস্থান (পালি, পরিযুট্ঠান)। তাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে চিত্তক্লেশ যখন সুপ্ত থাকে তখন তার নাম অনুশয়, যখন জাগ্রত হয়ে কর্মতৎপর হয় তখন তার নাম পর্যবস্থান। অনুশয় মূলতঃ ছয় প্রকার—রাগ, প্রতিঘ, দৃষ্টি, মান, বিচিকিৎসা (= সংশয়) এবং অবিদ্যা। দ্বিবিধ রাগ ভেদে (অর্থাৎ কামরাগ ও ভবরাগ) অনুশয় সাত প্রকার। আবার পঞ্চ দৃষ্টিভেদে (অর্থাৎ সৎকায়দৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি, অন্তগ্রাহদৃষ্টি, দৃষ্টি-পরামর্শ এবং শীলব্রতপরামর্শ) অনুশয় দশ প্রকার। বিভিন্ন ধাতুভেদে অনুশয়ের সংখ্যা ৯৮ (কামধাতু ৩৬ + রূপধাতু ৩১ + আরূপ্যধাতু ৩১ = ৯৮)। (**দীঘনিকায়**, সূত্র ৩৩, **অঙ্গুত্তরনিকায়**, ৭/২/১২, **অভিধর্মকোশ**, পঞ্চম কোশস্থান, **বিসুদ্ধিমগ্‌গো**, ২২/৬০)।

সুকোমল চৌধুরী

অনুসসতি (অনুস্মৃতি)—অনুস্মৃতি অর্থ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা (recollection)। অনুস্মৃতি ধ্যান বা ভাবনার বিষয়বস্তু বা কর্মস্থান (object)। বৌদ্ধ দর্শনমতে ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি অনুশীলন দ্বারা চিত্ত ও জ্ঞানের বিশুদ্ধি সাধন ও বিমুক্তি লাভ হয়। **বিসুদ্ধিমগ্‌গ, দীঘনিকায়** প্রভৃতি গ্রন্থে চল্লিশটি কর্মস্থানের (পালি-কম্মট্ঠান) উল্লেখ আছে তন্মধ্যে দশটি হচ্ছে অনুস্মৃতি, যথা :—(১) বুদ্ধানুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় রূপে বুদ্ধের নয় প্রকার গুণের স্মরণ ; (২) ধর্মানুস্মৃতি অর্থাৎ ধর্মের ছয় প্রকার গুণের স্মরণ ; (৩) সঙ্ঘানুস্মৃতি অর্থাৎ সঙ্ঘের নয় প্রকার গুণের স্মরণ ; (৪) শীলানুস্মৃতি বা নিজ শীলগুণের স্মরণ ; (৫) ত্যাগানুস্মৃতি—অর্থাৎ নিজ দানকার্যের গুণাবলী স্মরণ ; (৬) দেবতানুস্মৃতি অর্থাৎ শ্রদ্ধা, শীল, প্রজ্ঞাদি গুণের দ্বারা যেমন দেবতাগণ দেবজন্ম লাভ করেছেন, তেমনি নিজের মধ্যে তদ্রূপ গুণের সমাবেশের পুনঃ পুনঃ স্মরণ, (৭) উপশমানুস্মৃতি অর্থাৎ নিজের মধ্যে এবং নিজের চারপাশে উপশম বা শান্তি বিরাজমান তা' সর্বক্ষণ স্মরণ ; (৮) মরণানুস্মৃতি অর্থাৎ শবদেহ দর্শনে নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা স্মরণ। শেষের দুটিকে অনুস্মৃতির পরিবর্তে শুধু স্মৃতি বলা হয়েছে, যথা :—(৯) কায়গতস্মৃতি অর্থাৎ প্রতিটি দেহাংশ ও দৈহিক উপাদান উপক্লেশযুক্ত বলে ধ্যানের বিষয়রূপে উপস্থাপন ; এবং (১০) আনাপান স্মৃতি অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসকে আলম্বন করে ভাবনা করা।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অনোপমা

সাকেতের উচ্চ বংশীয় প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী মজ্ঝের কন্যা। অনুপম দেহ লাবণ্যের জন্য তাঁর নাম হয় 'অনোপমা'। অনোপমা বয়োপ্রাপ্ত হলে রাজা, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠিগণ বহু রত্নের বিনিময়ে অনোপমার পিতার কাছে কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে আসেন। একদা এক দূত তাঁর পিতাকে জানাল—অনোপমার ওজনে যত হিরণ্য ও রত্ন প্রয়োজন তার আট গুণ প্রদান করব, অনোপমাকে দিন। অনোপমা বললেন—আমি সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্রকেই বরণ করব। তিনি লোক-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে উপনীত হলেন। তাঁর ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে, উদ্বুদ্ধ হয়ে অনোপমা কেশভার ছেদন করে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করেন। সপ্তম রজনীতে তিনি অনাগামী স্তরে

উন্নীত হন (**পরমত্থদীপনী** পৃঃ ১৩৮)। **থেরীগাথায়** তাঁর নামে ৬টিগাথা (গাথা সংখ্যা ১৫১—১৫৬) স্থান পেয়েছে। গাথাগুলি শ্লোক ছন্দে রচিত। ভাষার শাঙ্কন্য ও সরলতা উল্লেখযোগ্য। গাথায় পদপ্রথার চিত্তাকর্ষক বাস্তবতার সে যুগের পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

আশা দাশ

অনোমদস্সী

১) **বুদ্ধবংসে** (বুদ্ধ বংস, ৮/১) একে সপ্তম বুদ্ধ বলা হয়েছে। চন্দ্রাবতীতে সুনন্দা উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন যশোবা এবং মাতা যশোধরা। তাঁর তিনটি রাজপ্রাসাদ ছিল—সিরি, উপসিরি এবং বড়্ঢ। তাঁর পত্নী সিরিমা এবং পুত্র উপবান। পরবর্তীকালে ইনি সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং দশমাস তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ লাভ করেন। সুভবতীর অন্তর্গত সুদস্সন নামক উদ্যানে ইনি প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। তাঁর প্রধান ভিক্ষু ছিলেন নিসভ এবং অসোক বা অনোম। ভিক্ষুনী ছিল সুন্দরী ও সুমনা। গৃহী ভক্তগণের মধ্যে নন্দি বড়্ঢ ও সিরি বড়্ঢ এবং উপাসিকাদের মধ্যে উপ্পলা ও পদুমার নাম উল্লেখযোগ্য। এঁর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজা ধম্মক। বরুণ ছিলেন এঁর চির অনুচর। এঁর প্রচেষ্টায় তিনটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভিক্ষু বকুলেথের এঁর সমসাময়িক ছিলেন। এই সময় বোধিসত্ত্ব একজন যক্ষ প্রধান ছিলেন। অনোমদস্সী তাঁকে ও তাঁর অনুচরবর্গকে সন্তুষ্ট করেন। ধম্মারাম নামক স্থানে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

২) অনোমদস্সী নামে একজন সন্ন্যাসীর কথা জানা যায়। তিনি সিখী বুদ্ধকে তৃণদান করেছিলেন। **বুদ্ধবংস অট্ঠকথা** পৃ. ২০১।

৩) অপর একজন অনোমদস্সী সিংহলের। তাঁর অনুরোধে **হত্থবনগল্লবিহারবংস** রচিত হয়। তিনি দৈবজ্ঞ কাম ধেনু নামে একটি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

দ্রষ্টব্য : G. P. Malalasekera, *Dictonary of Pali Proper Names*—
Vol. 1, p. 102

বেলা ভট্টাচার্য

অনোমা—কপিলবস্তু থেকে পূর্বদিকে ৩০ যোজন (প্রায় ২৫০ মাইল) দূরে প্রবাহিত নদী বিশেষ। কানিংহামের মতে ইহাই গোরখপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান অউমি (Aumi) নদী। কার্লাইল (Carilyle) এই নদীটিকে বস্তি জিলার অন্তর্গত কুদাবা (Kudawa) নদীর সহিত অভিন্ন বলে মনে করেন। গৌতম বুদ্ধের প্রব্রজ্যা গ্রহণের স্মৃতি-বিজড়িত নদীটি বৌদ্ধ কিংবদন্তীতে 'গৌরবময়' খ্যাতনামা (অনোমা) নদী বলে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। সিদ্ধার্থ (বুদ্ধ) কপিলবস্তু থেকে বেরিয়ে 'কন্থক' ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক রাতেই তিনটি রাজ্য (কপিলবস্তু এবং কুশীনারা ও পাবার ২টি মল্লরাজ্য) ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করে অনোমা নদীর ওপারে এসে পৌঁছান। আটটি পরপর দাঁড়ান বৃষের পরিমিত স্থান (অট্ঠউসভ—১৪০ হাত প্রস্থ) নিয়ে ছিল এই নদীটির বিস্তার। কন্থক সেই বিস্তীর্ণ নদী আরোহীকে নিয়ে এক লাফেই পার হয়ে ওপারে এসে উপস্থিত হয়। তারপর কন্থক ও ছন্নকে বিদায় দিয়ে সিদ্ধার্থ খড়্গে কেশ, গুম্ফ ও শ্মশ্রু ছেদন করে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাসধর্ম) গ্রহণ করেন; নিকটবর্তী অনুপিয় আম্রবনে সাতদিন কাটিয়ে আবার সেখান থেকে ত্রিশ যোজন পথ পায়ে হেঁটে সপ্তাহ শেষে রাজগৃহে এসে পৌঁছান।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অন্তরাভব—মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যবর্তী 'ভব' বা জন্ম। এই অবস্থায় সত্ত্বের নাম হয় অন্তরাভব-সত্ত্ব। এই অন্তরাভব সম্বন্ধে ধারণাটি অনেক পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মে এসেছে। বৌদ্ধ সাম্মিতীয় এবং পুব্বসেলিয় প্রভৃতি সম্প্রদায় সর্বপ্রথম অন্তরাভব সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করতে থাকেন। কিন্তু অশোক সঙ্গীতিতে তাঁদের এই মতবাদকে খণ্ডন করা হয়। (কথাবত্থু, পৃ. ৩৬৯—, ৪৯৩—)। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈভাষিক এবং বিজ্ঞানবাদীরা অন্তরাভব এবং এবং অন্তরাভব-সত্ত্ব সম্বন্ধে মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য ঘোষক অবশ্য একটু ঘুরিয়ে বলেছেন যে মৃত্যুর পর পঞ্চস্কন্ধের যে অবস্থা তাই অন্তরাভব ('মৃতেষ্ঠনন্তরং সর্বগতিপ্রাপকঃ পঞ্চস্কন্ধঃ অন্তরাভবঃ'—**অভিধর্মামৃত**, পৃ. ১৩৩)। সর্বাস্তিবাদীরা অবশ্য অন্তরাভব-সত্ত্বকে 'গন্ধর্বের' সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পনা করেছেন।

আচার্য বসুবন্ধু তাঁর **অভিধর্মকোশে** (৩/১০-১৬) অন্তরাভবের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন অন্তরাভব সত্ত্বগণ নিজেরাই তাদের ভাবী উৎপত্তিস্থল খুঁজে নেয়। তারা কিছু কিছু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। তারা দিব্যচক্ষু এবং সম্পূর্ণাঙ্গ-দেহযুক্ত। আকাশ-পথে গমন করতে পারে। প্রত্যেকের গতি নির্দিষ্ট। যেমন মনুষ্যলোকে যাদের জন্ম নেওয়ার কথা তারা অন্যলোকে যায় না। তারা স্থূলাহার গ্রহণ করে না, বরং গন্ধভুক হয়ে থাকে। প্রত্যেকের আয়ুষ্কাল ভিন্ন। পুনর্জন্ম লাভের উপাদানগুলো একত্রিত যতদিন না হয়, ততদিনই তাদের আয়ুষ্কাল। আচার্য বসুমিত্র বলেছেন যে অন্তরাভব-সত্ত্বের আয়ুষ্কাল মাত্র সাত দিন; অন্য কারও মতে সাত সপ্তাহ। ('সপ্তাহং তিষ্ঠতীতি ভদন্ত-বসুমিত্রঃ। যদি তাবতা সামগ্রীং ন লভতে মৃত্বা পুনশ্চাপি জায়তে। সপ্ত সপ্তাহানীত্যপরে'—**অভিধর্ম-কোশভাষ্য**, পৃ. ১২৬), অন্তরাভব-সত্ত্বগণ সূক্ষ্মদেহধারী। মনুষ্যাদি যে গতি প্রাপ্ত হবে তারই আকার ধারণ করে। যেমন, কামধাতুতে উৎপদ্যমান অন্তরাভবসত্ত্বের দেহ পঞ্চ-ষট্ বর্ষীয় শিশুর ন্যায়, তবে উন্নত অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্ন। পুংলিঙ্গধারী অন্তরাভবসত্ত্ব মাতৃকুক্ষির দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবেশ করে পৃষ্ঠাভিমুখ হয়ে থাকে, স্ত্রীলিঙ্গ হলে মাতৃকুক্ষির উত্তর দিক দিয়ে প্রবেশ করে উদরাভিমুখ হয়ে থাকে। আর যদি ক্লীবলিঙ্গধারী হয়, তবে তার অবস্থান নির্ভর করবে সহবাসকালীন জনক-জননীর অনুরাগের উপর। (নপুংসকং তদ্ যেন রাগে-নাশ্লিষ্টং তথা তিষ্ঠতি, **অভিধর্মকোশভাষ্য**, পৃ. ১২৭)। দেবলোকে উৎপদ্যমান অন্তরাভব-সত্ত্ব ঊর্ধ্বশিরঃ হয়ে চলে, নরকে উৎপদ্যমান হলে অধঃশিরঃ হয়ে চলে। অন্যান্য যোনিতে উৎপদ্যমান হলে সেই সেই যোনির স্বাভাবিক যা অবস্থা সেই অবস্থাতেই চলে। রূপী দেবলোকে উৎপন্ন অন্তরাভবসত্ত্ব বস্ত্রপরিহিত হয়ে থাকে, কামধাতুতে বোধিসত্ত্ব এবং তদনুরূপ অন্যান্যরা ভিন্ন সকলেই নগ্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। অরূপধাতুতে অন্তরাভবসত্ত্ব উৎপন্ন হয় না।

মহাযানীরা অন্তরাভবের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন মতই পোষণ করেন না। তবে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, একান্ত পুণ্যবান্ সত্ত্ব মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পরজন্ম লাভ করে এবং একান্ত পাপকর্মকারী সত্ত্বও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করে—পুণ্যবান্ একান্ত সুখকর জন্মলাভ করে, পাপী একান্ত দুঃখকর জন্মলাভ করে। অন্যান্য সত্ত্বগণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম নেয় না, হয়ত অন্তরাভবে কিছুকাল অবস্থান করে স্ব স্ব কর্মের গতি অনুসারে। 'সুখাবতী' সম্প্রদায়ের একটি শাখা অবশ্য বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পরে সুখাবতীতে উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে সত্ত্বগণ হয়ত বা অন্তরাভবে অবস্থান করতে পারে।

তবে 'অন্তরাভব' অবস্থা থাকুক বা নাই থাকুক প্রত্যেক বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সত্ত্ব পরজন্ম লাভ করে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কোথাও মৃতের জন্য পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ সপ্তম দিবসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চীনে এবং জাপানে প্রতি সাতদিনে একবার করে চিং-শি-চেম (অর্থাৎ সপ্ত সপ্তাহ) দিবস পর্যন্ত

ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করা হয়। (দ্রঃ, ১। **অভিধর্মকোশ,** ৩/১০—১৬। ২। কথাবত্থু, ৩১১—, ৪১৩—। ৩। **অভিধর্মামৃত,** পৃ. ১৩৩। ৪। **অভিধর্ম-কোশভাষ্য,** পৃ. ১২৬—১২৭। ৫।
বিশেষভাবে (দ্রষ্টব্য—*Encyclopaedia of Buddhism, 'antarābhava'.*)

সুকোমল চৌধুরী

অন্তানন্তিক

এই মতবাদটি দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে পাওয়া যায়।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী, তাঁরা চারটি কারণে জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত বলে থাকেন। অন্তানন্তিকবাদীদের মধ্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ ব্রাহ্মণ তাঁরা বলেন এই জগৎ সান্ত ও পরিচ্ছন্ন যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তাঁদের মতে এই জগৎ অনন্ত ও অসীম। তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ব্রাহ্মণ বলেন যে এই জগৎ সান্ত এবং অনন্ত। চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ ব্রাহ্মণ বলেন যে এই জগৎ সান্তও নয়—অনন্তও নয়। অন্তানন্তিকবাদী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত বলে প্রচার করে থাকেন।

বেলা ভট্টাচার্য

অন্ধকবিন্দ—মগধরাজ্যের অন্তর্গত কোন একটি বিশিষ্ট শহরতলি গ্রাম ; রাজগৃহ থেকে তিন গাবুত (তিন ক্রোশ) দূরে অবস্থিত। গৃধ্রকূট-উৎসারিত সপ্পিনী (বর্তমান পঞ্চান) নদীটি রাজ-গৃহ ও অন্ধকবিন্দের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বুদ্ধ অনেক সময় এইখানে অবস্থান করতেন এবং নানা উপলক্ষে ধর্মদেশনা দিতেন। এই নাম সম্পৃক্ত কয়েকটি সুত্ত ও বগ্‌গ **অঙ্গুত্তর ও সংযুত্তনিকায়** গ্রন্থ দুইখানিতে দেখা যায়। এই স্থানে বসেই বুদ্ধ একবার যবাগুর সপ্রশংস দশটি গুণের কথা বলেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বিসাখা মিগারমাতা আজীবন ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিত্য যবাগু দান করবার বর প্রার্থনা করে তার কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অন্ধবন—এটি শ্রাবস্তীর নিকট (এক গাবুত অন্তর দূরে) দক্ষিণদিকে অবস্থিত একটি স্বয়ংজাত বনবিশেষ। এর প্রাচীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন পালি গ্রন্থে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই নির্জন অরণ্যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা ধ্যান-সমাপত্তিতে লিপ্ত থাকার জন্য সচরাচর আসা যাওয়া করতেন। এখানে প্রণিধান বা ধ্যানানুশীলনের উপযোগী একটি বিশাল সমাধি-ঘরও (পধান ঘর) ছিল। **মজ্‌ঝিম ও সংযুত্তনিকায়**-গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধ রাহুলের নিকট 'চূল-রাহুলবাদ সুত্তটি' দেশনা করেছিলেন এবং সূত্রটির মর্মোপ-লব্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাহুলের অর্হত্বলাভ ঘটেছিল।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অপদান—অপদান সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের ষোড়শ গ্রন্থ। 'অপদান' শব্দের অর্থ মহৎ কর্ম বা বীরত্বপূর্ণ কীর্তি। জাতকে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম কাহিনী স্থান পেয়েছে। অপদানে অতীত ও বর্তমান উভয় কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া অপদানে বুদ্ধ এবং প্রধান প্রধান বুদ্ধ-শিষ্যের জীবনী বিধৃত। গ্রন্থটি দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত—থেরাপাদান এবং থেরী অপদান। থেরাপদানের দু'টি অংশ—(১) বুদ্ধাপদান (২) পচ্চেক বুদ্ধাপদান—বুদ্ধ ও প্রত্যেক-বুদ্ধ সম্বন্ধীয় আলোচনা। থেরাপদানে ৫৪৭ জন স্থবিরের আখ্যান আছে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকজন হলেন—সারিপুত্ত, মহামোগ্‌গল্লান, মহাকস্সপ, অনুরুদ্ধ, পুন্নমন্তানিপুত্ত, উপালি, অঞ্‌ঞকোণ্ডঞ্‌ঞ, পিণ্ডোল-ভারদ্বাজ, খদির বনিয়, রেবত, আনন্দ,

নন্দ, পিলিন্দবচ্ছ, রাহুল, রট্ঠপাল, সুমঙ্গল, সুভূতি, উত্তিয়, মহাকচ্চান, কালুদায়ী, চুন্দ, সেল, বকুল প্রমুখ। গ্রন্থের শেষাংশে থেরী অপদান—স্থবিরাদের কাহিনী। ইহা ৪টি বর্গে বিভক্ত। প্রতি বর্গে ১০টি করে মোট ৪০ জন স্থবিরার জীবনী বিবৃত হয়েছে। এ'দের মধ্যে অন্যতমা হলেন—গোতমী, খেমা, পটাচারা, ভদ্দা, কুণ্ডলকেসা, ধম্মদিন্না, যসোধরা, ভদ্দা কপিলানী, অভিরূপা নন্দা, অম্বপালী, সেলা। স্থবির-স্থবিরাদের জীবনী বৌদ্ধধর্মের ও সঙ্ঘের ইতিহাসের জন্য অপরিহার্য। অপদানের অধিকাংশ কাহিনী থেরথেরী গাথার অট্ঠকথা পরমত্থদীপনীতেও পাওয়া যায়। গ্রন্থটি গাথায় রচিত। 'তেন বুদ্ধং অপদানং'—বাক্যদ্বারা আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে অযত্ন সঙ্কলনের নিদর্শন পাওয়া যায়। একই কাহিনী কেবল কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন করে দু'জায়গায় স্থান পেয়েছে দেখা যায়। ত্রিপিটকে অপদান পরবর্তী সংযোজন। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় ঐতিহাসিক বুদ্ধের পূর্ববর্তী কেবল ছয়জন বুদ্ধের অস্তিত্ব রয়েছে দীর্ঘনিকায়ে। বুদ্ধবংসে গোতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী ২৪ জন বুদ্ধের নাম সংযোজিত হয়েছে। আর অপদানে রয়েছে ৩৫ জন বুদ্ধের নাম। সম্ভবতঃ গ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে সংগ্রথিত হয়েছে। মজ্ঝিম ভাণকগণ অপদানকে সুত্তপিটকের খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্গত করেছেন। অপদানের অট্ঠকথার নাম **'বিসুদ্ধজনবিলাসিনী'**। অপদানে ধর্মের প্রচলিত ও গতানুগতিক দিকের উপর, যেমন পূজা, বন্দনা, দান ইত্যাদি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থবির-স্থবিরাগণ স্তূপ পূজা ও পবিত্র দেহাবশেষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং দান ইত্যাদির দ্বারা স্বর্গলাভ এবং ক্রম উন্নতির পথে অর্হত্ত স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

আশা দাশ

অপণ্ণকসুত্ত—সুত্তটি **মজ্ঝিমনিকায়ের** ১ম, পৃ. ৪০০-১৩ গহপতি বগ্গের অন্তর্গত ৬০নং সুত্ত। কোশল রাজ্যের শালা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ সমাবেশে এই সুত্তটি বুদ্ধকর্তৃক দেশিত হয়। সমবেত ব্রাহ্মণদের কোন প্রিয় শাস্তা লাভ হয়নি, এজন্য ভগবান তাঁদের অপণ্ণক ধর্ম—যাহা অবিরুদ্ধ, দ্বিধারহিত এবং একাংশ গ্রাহিক সেই অদ্বৈতবাদী মার্গ গ্রহণ করতে বলেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নীতি—বিশেষতঃ ছয় অভিজাতি সহ জৈন ও আজীবিক ইত্যাদি মত আলোচনা করেন। চারিপ্রকার পুদ্গলের প্রকৃতিও ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেমন—

(১) আত্মন্তপ—যাঁরা আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত।
(২) পরসন্তাপী—যাঁরা পর পরিতাপানুযোগে লিপ্ত।
(৩) অনাত্মন্তপ—যে ব্যক্তি আত্মন্তপ নন, আত্মন্তপ কাজেও নিযুক্ত নন।
(৪) অপরন্তপ—যে ব্যক্তি পর পরন্তপ কার্যে নিয়োজিত নন। যে মানুষ অনাত্মন্তপ এবং অপরন্তপ তিনি ইহ-জীবনে তৃষ্ণা বিমুক্ত, নির্বাপিত এবং শীতিভূত; তিনি নিজে সুখ ভোগ করতে করতে ব্রহ্মভূত হয়ে যান। সুতরাং যিনি নিজেকে বা অন্যকে বেদনা দেন না তিনিই অর্হৎ, তিনি ইহ-জন্মেই পরিনির্বাপিত হন।

আশা দাশ

অপরগোযান—পালি ও বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যে এর বিভিন্ন রূপান্তর দেখা যায়—অপরগোযান, অপরগোযানীয়, অপরগোদান, অপরগোদানিক, অপরগোদানীয়, অপরগোদনী, প্রভৃতি। এটি বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত চতুর্মহাদ্বীপের অন্যতম। চক্রবাল বা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মহামেরু বা সুমেরু (সিনেরু) পর্বত এবং চারিদিকে রয়েছে চারিটী মহাদ্বীপ-উত্তরে উত্তরকুরু, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পশ্চিমে অপরগোযান আর পূর্বদিকে পূর্ববিদেহ। ৭০০০ যোজন বিস্তীর্ণ এই মহাদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল কল্পবৃক্ষ কদম্ব।

থেরগাথা অট্ঠকথায় দেখতে পাওয়া যায় যে, এদেশের লোকেরা ঘরবাড়ী ব্যবহার করত না ; ভূমির উপরই ছিল এদের শয়নাসনের ব্যবস্থা। বৌদ্ধ কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, একসময় নাকি রাজচক্রবর্তী মন্ধাতা সৈন্যসামন্ত নিয়ে অপরগোযান দ্বীপটি জয় করেন এবং তাঁর সঙ্গে এদেশের অনেক লোকজন জম্বুদ্বীপে (ভারতে) এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ; তাঁরা আর স্বদেশে ফিরে না গিয়ে জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন ; তাঁদের অধ্যুষিত এই উপনিবেশাঞ্চল পরবর্তীকালে 'অপরন্তক' আখ্যা লাভ করে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে, "এদেশ হচ্ছে সেই দেশ, পরবর্তীকালে যাকে বলা হয়, খোটান। 'গোদান' শব্দ রূপান্তরিত হয়ে খোটান, খোটন, খোটংন প্রভৃতি আকার ধারণ করেছে"। (ভারত ও মধ্য-এশিয়া, পৃঃ ৪২)

সুকুমার সেনগুপ্ত

অপরসেল

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শৈল সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের এক শাখা দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর এবং কৃষ্ণ জেলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। এরাই হচ্ছে চৈতিক, পূর্বশৈল, অপরশৈল এবং উত্তরশৈল। অপরশৈলগণ খুবসম্ভবতঃ কোন পর্বত হতে নাম নিয়েছিলেন। তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশে জনপ্রিয় ছিলেন বলেই অন্ধকগণ নামেও পরিচিত হয়েছিলেন (দত্ত, ২, ৪৯)। তৃতীয় খৃষ্টাব্দে ইক্ষ্বাকুদের সময়ে নাগার্জুনকোণ্ডে তাঁরা বসবাস করতেন (ম, সে, ২, ১৩)। বুদ্ধঘোষ তাঁদের ঐ একই অঞ্চলে অন্ধকের এক সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করেছেন (ক, ব, ১, ৯)। হিউয়েন-সাঙ্ ধানাকটকের পশ্চিমে অবস্থিত পর্বতে তাঁদের এক বিহার দেখেছিলেন (**ওয়াটার্স**, ২, ২১৪-২১৫)। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে (সপ্তম খৃষ্টাব্দে) অন্ধ্রপ্রদেশে যে প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন তাঁদের অনেকেই হয়ত অপরশৈল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (**হর্ষ**, ১২৫)। কিন্তু তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ বলেছেন যে সপ্তম খৃষ্টাব্দে ধর্মপাল এবং ধর্মকীর্তির সময়ে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেছলেন (**সেইফনের**, ১৭৫)।

চৈত্যকদের সহিত অপরশৈলদের মতবাদের বিশেষ তেমন পার্থক্য ছিল না। অপরশৈলগণ মনে করতেন যে বুদ্ধগণের কোন আসক্তি ছিল না, মোহ ছিল না এবং কোন পাপ ইচ্ছা ছিল না। তাঁরা দশ বলাধিকারের জন্য অর্হৎ হতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অপরশৈলগণের মতে কোন ভিক্ষু সত্য মতবাদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঘৃণা বা বিদ্বেষ হতে মুক্ত হবেন না। তাঁদের কাছে নির্বাণ ছিল একটি নিশ্চিত দোষশূন্য অবস্থা।
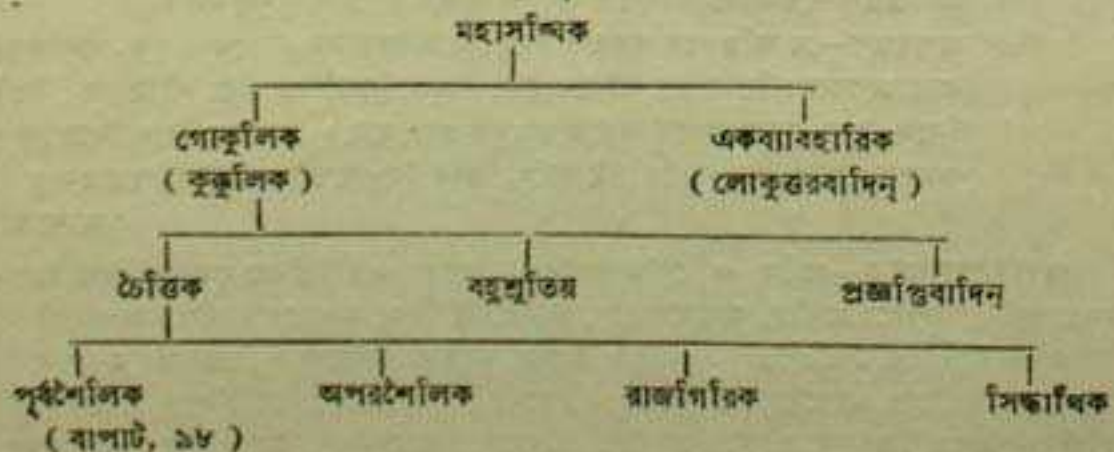
কানাইলাল হাজরা

অপ্পনা (অর্পণ)—বুদ্ধপ্রবর্তিত মার্গ প্রধানতঃ সাধনমার্গ। শীলপালনের দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষসাধন, চিত্তের শান্তিবিধান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতাসাধনই এই মার্গের লক্ষ্য। ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির দ্বারাই বিমুক্তি লাভ সম্ভব। বৌদ্ধমতে ধ্যানের ধারা দ্বিবিধ : শমথ ও বিদর্শন। চিত্তের পরম শান্তিবিধানকে উদ্দেশ্য করে ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির অনুশীলন হচ্ছে শমথ ভাবনা এবং শমথ ভাবনার সঙ্গে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকে বলা হয় বিদর্শন ভাবনা।

চার রূপধ্যানের প্রত্যেক ধ্যানস্তরকে উপচার ও অর্পণ এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। যখন যোগী (সাধনরত ভিক্ষু) আলম্বনে (ধ্যানের বিষয়, যথা—পৃথিবী) চিত্ত স্থির করে রূপ, শব্দ ইত্যাদি লক্ষণবিযুক্ত পূর্বপ্রত্যক্ষ বিষয়কে অন্তরে প্রত্যক্ষের থেকেও অধিকতররূপে দর্শন করেন, সেই অবস্থাকে বলা হয় উপচারভাবনা। এই অবস্থায় কিন্তু যোগীর চিত্ত সমাধিতে পূর্ণরূপে স্থির হয় না।

উপচারের পরবর্তী অবস্থা হল অর্পণ। কোন আলম্বন বা বিষয়ের ওপর চিত্তকে একাগ্রভাবে স্থাপন করাকে অর্পণ বলা হয় (একগ্গং চিত্তং আরম্মণে অপ্পেতি) অর্থাৎ চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে আলম্বনে অর্পিত হয় তখন চিত্তের অর্পণ অবস্থা। অর্পণ অবস্থায় যোগী চিত্তকে সর্বক্ষণ আলম্বনে নিযুক্ত রাখতে পারেন। একাগ্রচিত্তের এরূপ আলম্বনময়তাই পূর্ণ সমাধি। **বুদ্ধঘোষের** মতে উপচার থেকে অর্পণ পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য যোগীকে আবাসস্থল, ভিক্ষা চর্যার স্থান (গোচর), খাদ্য (ভোজন), সঙ্গী (পুগ্গল), অপ্রয়োজনীয় কথা (ভস্স), সময়োপযোগী আহার (উতু) এবং শোয়া-বসা ইত্যাদি শারীরিক অবস্থান (ইরিয়াপথ) ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে এবং দশটি বিধিপালন করতে হবে (দ্রঃ **বিসুদ্ধিমগ্গ**, পৃঃ ১০৭)।

দ্রষ্টব্য, *Early Monastic Buddhism*, I, p. 240.

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অপ্পমাদ

অপ্পমাদ (অপ্রমাদ) শব্দের অর্থ ব্যাপক ও গভীর ভাবদ্যোতক। বাংলায় এর ভাবার্থ একটি প্রতিশব্দের দ্বারা বোঝান যায় না। বিভিন্ন শব্দপ্রয়োগের দ্বারা এর মূল অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে, যথা, উত্থানশীলতা, কর্মতৎপরতা, পরাক্রম, সতর্কতা, উৎসাহ, অধ্যবসায়, সদাজাগ্রত উদ্যম, আপন আপন কর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠা, প্রভৃতি। বিপরীত প্রমাদ শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়—কর্তব্যে অমনোযোগ বা অবহেলা, দীর্ঘসূত্রতা, কর্তব্যচ্যুতি, নিদ্রালুভাব, আলস্য, নিশ্চেষ্টতা, প্রভৃতি। বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মের মূল নীতিই হ'ল এই অপ্রমাদ। পালি সাহিত্যের অনেক জায়গায় দেখা যায় যে বুদ্ধ অপ্রমাদ নীতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে 'অপ্রমাদ'ই একটি মাত্র বিশিষ্টার্থক শব্দ যার মধ্যে বুদ্ধের ধর্মোপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে। ডঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে "প্রত্যেকের নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক। ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষবাণী"। (**ভারতবর্ষের ইতিহাস**—১৯৩৪, পৃঃ ৪১)। **সংযুত্তনিকায়ের** কোসলসংযুত্তে দেখা যায়, কোসলরাজ প্রসেনজিৎকে বুদ্ধ উপদেশ দিচ্ছেন—"অপ্পমাদো খো মহারাজ একো ধম্মো"—সকলের জন্য একমাত্র ধর্ম হচ্ছে অপ্রমাদ। **অঙ্গুত্তর নিকায়ের** আর একটি সুত্তে বুদ্ধ বলেছেন—"ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ মঙ্গলের জন্য অপ্রমাদানুশীলন একমাত্র ধর্ম। যতপ্রকার জঙ্গম প্রাণীর পদচিহ্ন আছে, তাদের মধ্যে হস্তিপদ চিহ্নই সবচেয়ে বড়। এরূপ কি ঐহিক কি পারলৌকিক সবপ্রকার কল্যাণার্জনের পক্ষে অপ্রমাদানুশীলনই সবচেয়ে উপকারক ধর্মনীতি"। **মহাপরিনিব্বান-সুত্তে** দেখা

যায় পরিনির্বাণের প্রাক্কালে বুদ্ধ তাঁর অন্তিম দেশনায় বলে গেছেন—"বয়ধম্মা সঙ্খারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ" অর্থাৎ সকল সংস্কার (সকল মিশ্র পদার্থ ও সত্তা) বয়ঃধর্মের অধীন (ক্ষয়ধর্মশীল বা অনিত্য), অতএব অপ্রমাদের সহিত সমস্ত কার্য সম্পাদন করিবে"—ইহাই তথাগত বুদ্ধের শেষ বাণী।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুযায়ী (**মহাবংস, সমন্তপাসাদিকা**) সম্রাট অশোকের কাছে শ্রমন ন্যগ্রোধ **ধর্মপদের** অপ্রমাদ বর্গটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। **দীপবংসে** শুধু প্রথম গাথাটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় :—

"অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথা মতা।"

অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। যাঁরা অপ্রমাদপরায়ণ তাদের মৃত্যু হয় না, যাঁরা প্রমত্ত তাঁরা বেঁচে থেকেও মৃতেরই সামিল'। এই আবৃত্তিরই প্রত্যক্ষফল স্বরূপ অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। যদিও 'অপ্রমাদ' কথাটির প্রয়োগ অশোকানুশাসনে দেখা যায় না, তথাপি এর ভাবার্থসূচক 'উসটান', 'উযাম', 'উসাহ', 'পকম', 'পরাক্রম' শব্দগুলি তাঁর লিপিগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, অশোক তাঁর জীবনদর্শন ও ধর্মের মূলভিত্তি স্থাপন করেছিলেন অপ্রমাদকে আশ্রয় করে।

ভাগবৎ বা বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রধান নীতিও ছিল অপ্রমাদ। প্রাচীন গান্ধার জনপদের এক গ্রীক রাজার দূত বাসুদেবভক্ত (বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী) হেলিওদোরস্ খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের শেষভাগে কাশীপুত্র ভাগভদ্রের রাজত্বকালে বিদিশা নগরে (বর্তমান বেসনগরে) একটি গরুড়ধ্বজ বাসুদেবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই স্তম্ভগাত্রে অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে নিম্নলিখিত মূল্যবান নীতিগাথাটি খোদাই করিয়ে রাখেন—

'তিনি অমুতপদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ'।

—'দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটি অমৃতপদ সুঅনুষ্ঠিত হলে স্বর্গে নিয়ে যায়'। মহাভারতের স্ত্রীপর্ব ও উদ্‌যোগপর্বের স্থানে স্থানে অপ্রমাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষতঃ উদ্‌যোগপর্বের উক্তি—'প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, তথা' প্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি' (প্রমাদকে মৃত্যুস্বরূপ বলি, আর অপ্রমাদকে অমৃতই বলি)—এই উক্তিটি ধম্মপদস্থ অপ্পমাদবগ্গের "অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মুচ্চুনো পদং" কথাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পালি-প্রাকৃত ধম্মপদ ও সংস্কৃত উদানবর্গের অন্তর্ভুক্ত অপ্রমাদ সংক্রান্ত গাথাগুলি ছাড়াও, **সংযুত্তনিকায়ের** মহাবগ্গের বিভিন্ন সংযুত্তে অপ্পমাদ নামধেয় আরও কয়েকটি পৃথক পৃথক **বগ্‌গ (অপ্পমাদ বগ্‌গ)** দেখা যায়। আবার **সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তর** নিকায় গ্রন্থ দুইখানির বিভিন্ন খণ্ডে অপ্পমাদ নামাঙ্কিত কয়েকটি সুত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অপ্রতিসংখ্যানিরোধ—সর্বাস্তিবাদীদের ৭৫ প্রকার ধর্মের অন্যতম এবং বিজ্ঞানবাদীদের ১০০ প্রকার ধর্মের অন্যতম ধর্ম। ইহা অসংস্কৃত ধর্ম অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা উৎপন্ন নয়। অপ্রতিসংখ্যার দ্বারা নিরোধ বা নিবৃত্তি। অর্থাৎ উৎপাদনশীল হেতুর নিরবশেষ ধ্বংসের যে নিবৃত্তি উপলব্ধ হয় তার নামই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। অপর একটি

নিরোধের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থাৎ প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধ নিবৃত্তি। সর্বাস্তিবাদীদের মতে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ একটি বর্তমান ধর্ম। যখন কোন ধর্ম হেতুরহিত হয় তখন অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ঐ ধর্মের উৎপত্তি নিবারিত করে যাতে সেই ধর্ম চিরতরে ভবিষ্যতের অবস্থায় থেকে যায়, পুনরায় উৎপন্ন না হয়। কিন্তু সৌত্রান্তিকগণ সর্বাস্তিবাদীদের এই মতবাদে বিশ্বাসী নহেন। তাঁদের মতে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উৎপন্ন ধর্ম হতেই পারে না, এটা একটা সাময়িক উপলব্ধের জন্য উদ্দিষ্ট নামমাত্র। উৎপাদনশীল হেতুর অভাবে কোন ধর্মের অনুৎপত্তির নামই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। মহাসাংঘিকগণও মোটামুটি সৌত্রান্তিকদের মত সমর্থন করেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীদের মতে সকল অসংস্কৃত ধর্মই তথতার অংশবিশেষ। অতএব, অপ্রতিসংখ্যানিরোধও সর্বসাধারণ (universal) তথতারই অংশ এবং এটা প্রতীয়মান হয় যখন উৎপাদনশীল হেতুর অভাবে ধর্মবিশেষের অনুৎপত্তি বা নিবৃত্তি ঘটে (উৎপাদাত্যন্তবিঘ্নোঽন্যো নিরোধোঽপ্রতিসংখ্যয়া, অ. কো. ১/৬)। (১) **অভিধর্মকোশ**, ১/৬, ভাষ্যসহ (২) **বিভাষা**, ৩২, ৫)।

সুকোমল চৌধুরী

অবে্ভাকাসিকঙ্গ

বিনয়পিটকে ভিক্ষুদের জীবনচর্যা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রথমদিকে আমরা দেখি যে ভিক্ষুগণ গুহায় বনজঙ্গলে বসবাস করতেন। তখন কমপক্ষে চারটি নিশ্রয় ভিক্ষুগণ পালন করে চলতেন।

প্রথমতঃ পিণ্ডিয়ালোপ ভোজন, অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি করে খাদ্যগ্রহণ।

দ্বিতীয়তঃ পংসুকুলচীবর অর্থাৎ পরিত্যক্ত বস্ত্র থেকে সংগৃহীত ছিন্নবস্ত্র পরিধান।

তৃতীয়তঃ বৃক্ষমূল সেনাসন—অর্থাৎ বৃক্ষের নিচে আশ্রয়গ্রহণ।

চতুর্থতঃ পূতিমুত্তভেসজ্জ—অর্থাৎ অত্যন্ত নোংরা জিনিষকে ওষুধ হিসাবে গ্রহণ।

বুদ্ধঘোষ তাঁর বিসুদ্ধিমগ্গে ব্রহ্মচর্যজীবন যাপনের জন্য তেরটি নিয়মের কথা বলেন। এই তেরটির মধ্যে দশমটি হল অবে্ভাকাসিক। আমরা চারটি নিশ্রয়ের মধ্যে তৃতীয় নিশ্রয়টি পাই ভিক্ষুগণ বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। এই তৃতীয় নিশ্রয়ের সঙ্গে এটির মিল দেখতে পাই। অবে্ভাকাসিক ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে বসবাস করবেন। তাঁরা গাছের তলায় বসবাস করবেন না। এমনকি গাছের ছায়াতেও নয়। যদি বৃষ্টিপাত হয় তখন আচ্ছন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। অবে্ভাকাসিকঙ্গ একটি ধুতঙ্গ।

দ্রষ্টব্য, N. Dutt, *Early Monastic Buddhism*—p. 157

বেলা ভট্টাচার্য

অভয়গিরি

সিংহলী ইতিবৃত্তে অভয়গিরিকে অভয়ুত্তর, অভয়-বিহার অভয়াচল এবং উত্তর বিহার বলে উল্লেখ আছে। সিংহলী রাজা বট্টগামণি অভয় (৮৯-৭৭ খৃষ্টপূর্ব) অনুরাধপুরে সুবিখ্যাত নিগণ্ঠ (জৈন) গিরির বিহার ধ্বংস করে এখানে অভয়গিরি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নিকটে একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহাতিস্স থেরকে বিহারটি উৎসর্গ করেছিলেন। (**ম, ব**, ৩৩, ৮১-৮২)। প্রথমে মতবাদে অথবা অনুশীলনে অভয়-গিরি এবং মহাবিহারের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু পরে এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অভয়গিরির ভিক্ষুগণ ধম্মরুচিক নামেও পরিচিত হয়েছিলেন (**নি, স**, ১১)। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় এবং নূতন ধর্মীয় আন্দোলন এর সহিত নিজেদের

দৃঢ়ভাবে যুক্ত করেছিলেন। তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই উদার ছিলেন। তাঁরা থেরবাদ এবং মহাযান পড়াশুনা করতেন এবং তাঁদের দ্বারা ত্রিপিটক চারিদিকে প্রচারিত হয়েছিল। মহাবিহারের ভিক্ষুগণের চোখে তাঁরা ছিলেন অগোড়া পন্থী এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী। নিকায়-সংগ্রহের মতে বৈতুল্যগণ কর্তৃক রচিত বৈতুল্য-পিটককে অভয়গিরির ভিক্ষুগণ বুদ্ধের উপদেশ বলে নিয়েছিলেন এবং থেরিয়-নিকায়ের ভিক্ষুগণ কর্তৃক ধর্ম এবং বিনয় সহ গঠিত মতবাদকে মিথ্যা উপদেশ ঘোষণা করে অগ্রাহ্য করেছিলেন (**নি. স, ১১**)। সিংহলের মহাসেনের রাজত্বকালে (৩৩৪-৩৬২ খৃষ্টাব্দ) অভয়গিরি রাজার অনুগ্রহ লাভ করে। মহাসেনের পুত্র সিরিমেঘবন্নের রাজত্বকালে ৩৬২ খৃষ্টাব্দ বোধিবৃক্ষ অভয়গিরিতে লাগান হয়েছিল এবং জনসাধারণের দেখানোর জন্য দন্তধাতুকে প্রতি বৎসর অভয়গিরিতে নিয়ে যাওয়া (**দা, ব, ৩৪০**) হত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের সিংহল পরিভ্রমণ কালে অভয়গিরিতে ভিক্ষু সংখ্যা ছিল ৫,০০০ হাজার (**হি, বি, ৯৮**)। সিলকালের রাজত্বকালে (৫২৪-৫৩৭ খৃষ্টাব্দ) অভয়গিরির ভিক্ষুগণ কাশী হতে আনা ধর্মধাতু গ্রন্থকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়েছিলেন (**ম, ব, ৪১, ৩৭-৪০**)। মহিন্দ দ্বিতীয় অভয়গিরির উপোসথঘরে রতন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম সেন বা মত্তবল-সেনের রাজত্বকালে (৮৩১-৮৫১ খৃষ্টাব্দ) ভারতের বজ্রপরবত সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ অভয়গিরি বাজিরিয়বাদ বা বজ্রযান সিংহলে প্রচার করেছিলেন (**নি, স, ১৬**)। প্রথম বিজয়বাহু তামিলগণ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত অভয়গিরি স্তূপকে ১৬০ কিউবিট উচ্চতায় স্থাপন করেছিলেন (**চু, ব, ৭৮**)। কিন্তু রাজধানী অনুরাধপুর চিরতরে পরিত্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অভয়গিরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

মধ্য জাভার রটভুক উৎকীর্ণ লিপিতে মধ্য জাভায় প্রতিষ্ঠিত অভয়গিরির উল্লেখ আছে।

কানাইলাল হাজরা

অভয় রাজকুমার

অভয় রাজকুমারকে অভয় বলে অভিহিত করা হয়। এটি আমরা পাই **মজ্‌ঝিম-নিকায়ে গলচ্ছিগ্‌গলুপম সুত্তে**। মগধের রাজা বিম্বিসারের পুত্র ছিলেন অভয় রাজকুমার, মার নাম ছিল পদুমবতী। অভয় রাজকুমারের যখন সাতবছর বয়স ছিল তখন তাঁর মাতা তাঁকে রাজার কাছে পাঠালেন এবং সেখানে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রমশঃ বড় হতে লাগলো। নিগ্রন্থ নাথ পুত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। রাজা বিম্বিসারের মৃত্যুর পর রাজকুমার মানসিক বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। পরে রাজকুমার সংঘে প্রবেশ করেছিলেন এবং অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

অভয় রাজকুমার সূত্রে আমরা পাই যে রাজগৃহে বুদ্ধের সঙ্গে অভয় সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং নিগ্রন্থ কর্তৃক স্থিরীকৃত প্রশ্ন করেছিলেন তথাগত কি অন্যদের অসুখীকর বা সন্মাতিজনক কিছু বলে? যদি সে এরকম বলে তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? যদি তা না হয় তবে দেবদত্তের সঙ্গে রাগান্বিত হওয়ার কারণ কি? এইভাবে কথোপকথন হওয়ার পর সবশেষে অভয় বুদ্ধকে শিক্ষকরূপে পরিগণিত করে তাঁর মতামত গ্রহণ করলেন।

বেলা ভট্টাচার্য

অভয়া

অভয়া উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অভয়মাতা পদুমাবতীর খেলার সঙ্গিনী ছিলেন। পদুমাবতী বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের জননী। অভয় ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে অর্হৎ হন। উভয় সখী—অভয়া ও পদুমাবতী অর্হতের উপদেশ শুনে সংসারত্যাগ করেন। অভয়া যখন

সীতবনে ধ্যানস্থ ছিলেন তখন বুদ্ধদেব তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য আলোক-রশ্মি প্রেরণ করেন (**পরমথদীপনী**, পৃ. ৩৩—৩৪)। **থেরীগাথায়** অভয়া বলেছেন—বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হয়ে তিনি দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করেছেন এবং তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখ-মূল বিনাশ করেছেন। (**থেরীগাথা**, শ্লোক সং ৩৫, ৩৬)। গাথা দু'টি শ্লোক ছন্দে রচিত।

'সিখী' বুদ্ধের সময়ে তিনি বুদ্ধের পিতা অরুণবার প্রধানা মহিষীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি তাঁর স্বামীর প্রদত্ত, পদ্মফুল বুদ্ধকে অর্পণ করেন। এই সুকৃতির জন্য পরবর্তী জন্মে তিনি পদ্ম-বর্ণা ও পদ্ম-সৌরভময়ী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

অভয়া অপদানের '**সত্তুপ্পলমালিকার**' সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন হয়েছেন। (**অপদান**, ২, পৃ. ৫১৭—১৮)

আশা দাশ

অভয়াকরগুপ্ত—গৌড়দেশীয় খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন অভয়াকরগুপ্ত। তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব সময় নিয়ে পণ্ডিতসমাজে মতভেদ আছে। তিব্বতীয় ঐতিহ্যানুসারে Rai S. C. Das Bahadur অভয়াকর গুপ্তের সময়সীমা নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি ধরেছেন (দ্রঃ, *'Lives of the Panchhen-Rinpochhes or Tasi Lames' JASB*; 1882, pp. 16-18) আবার Phanindra-nath Bose এর মতানুসারে অভয়াকরগুপ্ত একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (দ্রঃ, *Indian Teachers of Buddhist Universities*, pp. 81 f.)

রাজা রামপালের শাসনকালে তিনি মগধদেশে পড়াশুনা করে শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা, এই পঞ্চবিদ্যায় বা বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ভিক্ষুসংঘে যোগ দেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। রাজা রামপালের আমন্ত্রণে তিনি তাঁর প্রাসাদে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতেন ও অবসর সময়ে কঠোরভাবে শাস্ত্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করতেন। (দ্রঃ, *Ancient Indian Education*, R. K. Mookerji (1951); Tāranātha's *Geschichte des Buddhismus* (A. Schiefner), pp. 250 ff.)

অভয়াকরগুপ্ত সেই যুগে শাস্ত্রকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তিব্বতীয় ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে *Thén-wa-korsum*, *Commentaries on Khajor (Mkhaḥ-ḥgro)*, *Man-Ñag*, *Ñema* ও *Sanye thod-pai-nam-shé-mi-jigpa (Sańs-rgyas-thod-paḥi rnam-shes mi-ḥjigs-pa)* বইগুলি ও অন্যান্য গ্রন্থের টিকার সমালোচনাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহাযান সম্প্রদায়ের প্রধান ভিক্ষু অভয়াকরগুপ্ত অতীশ দীপঙ্করের ন্যায় স্বয়ং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন ও অন্যান্য অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। শ্রাবকগণ কর্তৃক শ্রদ্ধার সঙ্গে আদৃত হতেন। তিনি বহুকাল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের পূর্বপ্রান্তীয় রাজা শুভশ্রীর পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে। তাঁর সম্বন্ধে তিব্বতে বহু অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী প্রচলিত আছে। তিব্বতীয় ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে তিনি *Śrī Mahākāla-sādhana-nāma*, *Śrīmahākālāntarasādhana-nāma*, *Siddhaikavira-sādhana*, *Vajrayāgamūlāpattikarma-śāstra*, *Kālisūrya-cakravaśa-(kriyā)-nāma*, *Gaṇacakrapūjākrama-nāma* এবং *Saṃkṣipta-*

vajravārāhisādhana প্রভৃতি তন্ত্রবিষয়ক বইগুলি সম্ভবতঃ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালে সংস্কৃত ভাষা থেকে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচিত *Abhiṣeka-prakaraṇa* নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি তিনি নিজেই তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়াও *Śri-kāla-cakroddāna, Śrī-cakra-saṃvarābhisamaya, Svādhiṣṭhāna-kramopadeśa-nāma, Cakraśambarābhisamayopadeṣa, Śri-sampuṭa-tantrarājaṭikā-āmnāyamanjarīnāma, Śrī-buddhakapālamahātantra-rājaṭikā-Abhayapaddhati-nāma, Pañhacakramataṭikā-candraprabhā-nāma, Raktyamāntaka-nispannayoganama, Gaṇacakravidhināma, Vajrayānāpattimañjari-nāma, Vajrāvalināmamaṇḍalopāyikā, Niṣpanna-yogāvalināma, Jyotirmañjarī-nāmahomopāyikā, ucchuṣmajambhala-sādhana-nāma, Bodhipaddhati-nāma, Śrimahākāla-karmasambhāra, Vajramahākālakarmoccāṭanābhicāra-nāma, Vajramahākālakarma-vibhaṅgābhicāra-nāma, Vajramahākālakarmakāyastambhanābhicāra-nāma, Vajramahākālakarmavākstambhanābhicāra-nāma, Vajramahā-kālakarmacittastambhanābhicāra-nama, Vajramahākālakarmabha-vaśoṣaṇābhiśāpa-nāma, Vajramahākālakarmabhicārapratisanjivana-sāntikarma-nāma, Upadeśamañjarī-nāma-sarvatantrotpannopanna-sāmānyabhāṣya* এই ২৬খানি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাড়াও Mdo-Ḥgrel বা সূত্রস্থানীয় গ্রন্থ তিনি রচনা করেন—*Āryāṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāvṛttimarma-kaumudi-nāma* এবং *Munimatālaṅkāra*। ইহা ছাড়া *Bodhisattvaṣaṃvara-grahaṇavidhi* (III, 333), *Jñānaḍākinisādhana* (II, 100), *Kalacakrā-vatāranāma* (II, 22) এবং *Śri-Mañjuvajrā-dikarmābhisamayasamuccaya-niṣpannayogāvalināma* (III. 230) প্রভৃতি বইগুলি Cordierর মতানুসারে তাঁর রচনাগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। *Vajramahākālābhicārahoma-nāma* যে গ্রন্থ নাগার্জুনের নামের সঙ্গে যুক্ত, তার রচয়িতা হিসাবেও অভয়াকরগুপ্তের নাম করা হয়। মনে হয় অভয়াকরগুপ্ত নাগার্জুনের বিভিন্ন মতবাদ সংগ্রহ করে এই গ্রন্থ রচনা করেন। (এবিষয়ে দ্রষ্টব্য—*Indian Teachers of Buddhist Universities*, পৃঃ ৮৮-৯০; *Sādhanamālā, II* (*G.O.S.* No. XLI) পৃঃ xc-xci.)

অভয়াকর গুপ্ত *Tengyur* এ পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য, সিদ্ধ ও স্থবির; ও তিব্বতে Ḥjigsmed ḥbyuṅgnas sbas-pa বা Ḥjigsmed ḥbyuṅ-gnas sbaspaḥi shabs প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। অভয়াকরগুপ্তের তিরোভাব সম্ভবতঃ ১১২৫ খৃ. হয়েছিল। (দ্রঃ, *L'Inde Classique*, II. Sec. 2039).

দ্রঃ, এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—*Encyclopaedia of Buddhism, Fas : A-Aca*, 1961; পৃঃ ২৮-২৯ T. Rajapatirana র নিবন্ধ।

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অভিঞ্‌ঞা (অভিজ্ঞা)

অভিজ্ঞা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষ জ্ঞান। পালিতে অলৌকিক জ্ঞান অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দুই প্রসঙ্গে অভিজ্ঞা শব্দটি পাওয়া যায়। প্রথমতঃ মধ্যম প্রতিপদ (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) প্রসঙ্গে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের বলেছিলেন: "হে ভিক্ষুগণ, এই দুই

অন্তর (অতিরিক্ত কামসুখে নিমগ্ন থাকা ও অতীব কৃচ্ছ্রসাধন) অনুগামী না হয়ে তথাগত মধ্যম প্রতিপদ অভিসম্বোধি জ্ঞানে লাভ করেছেন যা' চক্ষুকরণী ও জ্ঞানকরণী এবং যা' উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অভিমুখে সংবর্তিত হয়"। স্মৃতিপ্রস্থানের দ্বারাও অভিজ্ঞা লাভ করা যায় (সংযুত্তনিকায়, ৫ম পৃ ১৭১)। দ্বিতীয়তঃ ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতার তালিকায় ছয় প্রকার অভিজ্ঞার (পালি ছল্‌ভিঞ্ঞা) উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা (১) ঋদ্ধি, (২) দিব্যচক্ষু, (৩) দিব্যশ্রোত্র (৪) অন্যের চিন্তা সম্পর্কে জ্ঞান (পরচিত্ত বিজাননন) (৫) পূর্ব জন্ম স্মরণ ও (৬) আসবক্ষয় জ্ঞান। কোন কোন গ্রন্থে পঞ্চাভিজ্ঞা ও সপ্তাভিজ্ঞার উল্লেখও পাওয়া যায়। **মহাবস্তু, ললিতবিস্তর,** প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে একই অর্থে অভিজ্ঞা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। **বিসুদ্ধিমগ্‌গ, পরমত্থমঞ্জুসা, বিভঙ্গ,** প্রভৃতি গ্রন্থে অভিজ্ঞাগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং অধিষ্ঠান, মনোময়জ্ঞানবিস্ফার, সমাধিবিস্ফার প্রভৃতি বহুবিধ ঋদ্ধির কথা আলোচিত হয়েছে। **দীঘনিকায়ের কেবট্টসুত্ত** থেকে জানা যায় বুদ্ধ অভিজ্ঞার অপব্যবহার সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অভিজ্‌ঝা (অভিধ্যা)

অভিধ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বিশেষভাবে চিন্তন। অন্য অর্থ পরদ্রব্যে স্পৃহা বা লোভ। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া শব্দটির বাংলা অনুবাদ করেছেন লোভের প্রবৃত্তি (**মধ্যমনিকায়** পৃঃ ৪৬) যার ইংরাজী অনুবাদ covetousness। **ধম্মসঙ্গণিতে** (*১০৫৯) লোভের শততম প্রতিশব্দ হচ্ছে অভিজ্‌ঝা। কিন্তু **মজ্‌ঝিমনিকায়ের সম্মাদিট্‌ঠি** সুত্তে অভিধ্যাকে বলা হয়েছে—অকুশল এবং লোভকে অকুশল মূল। পালি নিকায়গুলিতে অভিধ্যার সঙ্গে দৌর্মনস্য শব্দটি যুক্ত দেখা যায় (অভিজ্‌ঝা দোমনস্সং)। **দীঘনিকায়ের** মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তে উক্ত হয়েছে—স্মৃতিপ্রস্থানকারী ভিক্ষু কায়-বেদনা-চিত্ত-ধর্মানুপশ্যী হয়ে প্রথমেই অভিধ্যাদৌর্মনস্য (অভিধ্যাহেতু চিত্তের বিষাদ ভাব) বিদূরিত করেন। ধ্যান বা আধ্যাত্মিক উচ্চ চিন্তাধারায় প্রতিবন্ধক পঞ্চনীবরণ (five hindrances) হচ্ছে অভিধ্যা, ব্যাপাদ (হিংসা প্রবৃত্তি), স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য), ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য (মনের চাঞ্চল্য) ও বিচিকিৎসা (সন্দেহ বা দ্বিধা ভাব)। এই পঞ্চনীবরণ দূরীভূত করতে না পারলে যোগী ধ্যানস্তরে প্রবেশ করতে পারেন না। কাজেই অর্হত্বলাভের জন্য ভিক্ষু প্রথমেই অভিধ্যা পরিত্যাগ করে অভিধ্যামুক্ত হয়ে পৃথিবীতে বিহার করেন এবং অভিধ্যা থেকে চিত্তকে বিশুদ্ধ করেন (সো অভিজ্‌ঝং লোকে পহায় বিগতাভিজ্‌ঝেন চেতসা বিহরতি, অভিজ্‌ঝায় চিত্তং পরিসোধেতি)। **বত্থূপম** সুত্তে অভিধ্যাকে চিত্তের উপক্লেশ রূপে (impurity) বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক সুত্তে পঞ্চনীবরণের তালিকায় অভিধ্যার স্থলে কামচ্ছন্দ (sensual lust) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পালি নিকায়ে দশ অকুশল কর্মপথের তালিকায় অভিধ্যা একটি। দীঘনিকায়ে উল্লিখিত হয়েছে—অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক্‌ স্মৃতি ও সম্যক্‌ সমাধি হচ্ছে ধর্মের ভিত্তি (চত্তারি ধম্মপদানি)। **ব্রাহ্মণধম্মিক** সুত্তে বুদ্ধ বর্ণনা করেছেন কিভাবে অতীতের সৎ ব্রাহ্মণগণ রাজার ধনসম্পদ দেখে অভিধ্যাপরায়ণ (অভিজ্‌ঝালু) হয়ে পড়েছিলেন। **মজ্‌ঝিমনিকায়ের আনঞ্জসপ্পায়** সুত্তে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা কি ভাবে অভিধ্যা দূরীভূত করা যায় তা' ব্যক্ত করেছে।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অভিধম্মত্থসঙ্গহ (অভিধর্মার্থসংগ্রহ)—ইহা পালি ভাষায় বিরচিত অভিধর্ম সংক্রান্ত সারগ্রন্থ। সিংহলের মূলসোম বিহারের অধিবাসী আচার্য অনুরুদ্ধ আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ

/দ্বাদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (দ্রঃ *Dictionary of Pali Proper Names*)। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এই গ্রন্থ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে উভয় দেশে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারে অভিধর্ম শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক হিসাবে গৃহীত হয় এবং বহু টীকা বা ব্যাখ্যাপুস্তক লিখিত হয়। তন্মধ্য নবাবিমলবুদ্ধি কৃত **'পোরাণটীকা'** ; সুমঙ্গল স্থবির কৃত **'অভিধম্মত্থবিভাবনী'** ; সদ্ধম্মজোতিপাল কৃত **সঙ্খেপবণ্ণনা** ; বেপুল্লবুদ্ধি কৃত **অনুটীকা** এবং অরিয়বংস কৃত **নবানুটীকা** উল্লেখযোগ্য। আচার্য বুদ্ধদত্ত কৃত **'রূপারূপবিভাগ'** এজাতীয় একখানি ক্ষুদ্রকায় পূর্ববর্তী গ্রন্থ। কিন্তু **অভিধম্মত্থসঙ্গহে** অর্থকথা সহ সমগ্র অভিধর্মপিটকে সন্নিবিষ্ট ও আলোচিত বিষয়গুলি নিপুণতরভাবে সুবিন্যস্ত হয়েছে। এর পরিচ্ছেদ সংখ্যাও অধিকতর। উপরন্তু এই গ্রন্থে অভিধর্মের বিষয় সমূহের অতিরিক্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। যদিও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে **অভিধম্মত্থসঙ্গহ** আচার্য বুদ্ধঘোষ কৃত **বিসুদ্ধিমগ্‌গের** সমতুল, তথাপি উভয় গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। বিসুদ্ধিমগ্‌গে বুদ্ধঘোষ প্রয়োজনমত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বা অর্থনিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন এবং শীল পালন ও ধ্যানভাবনার দ্বারা বিশুদ্ধি বা মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছেন। আর অভিধম্মত্থসঙ্গহ একটি সংক্ষিপ্ত পরিভাষাগ্রন্থ মুদ্রিতাকারে যার পৃষ্ঠা সংখ্যা পঞ্চাশের মধ্যে। তবে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্য এই গ্রন্থ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আচার্য বুদ্ধদত্ত কৃত 'রূপারূপবিভাগে' অভিধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়কে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ ; সংক্ষেপে বলা যায় দুটি বিষয়, যথা—রূপবিভাগ ও অরূপবিভাগ। অভিধম্মত্থসঙ্গহে এই বিষয়গুলি আরো বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ 'চিত্তসঙ্গহবিভাগে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল চার ভূমিভেদে চিত্তের (state of consciousness) শ্রেণীবিভাগ। অভিধর্মে জীবজগতের ক্রমবিন্যাসের সাহায্যে চিত্তোৎপাদের, চিত্ত ও চৈতসিকের ধারা, ক্রম ও শ্রেণীবিভাগের প্রয়াস দেখা যায়। জীবজগতের ক্রমবিন্যাসকে ভূমি বলা হয়। সর্বনিম্নে কামলোকের চার স্তর, যথা—নিরয়লোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক ও কামদেবলোক। কামলোকের ঊর্ধ্বে রূপলোকের ষোলটি স্তর ; তদূর্ধে অরূপলোকের চার স্তর এবং সর্ব ঊর্ধ্বে লোকোত্তরের আটটি স্তর কল্পনা করা হয়েছে। চার ভূমিতে উৎপন্ন চিত্তগুলির নাম যথাক্রমে কামাবচারী, রূপাবচারী, অরূপাবচারী ও লোকোত্তরাবচারী। কামাবচরচিত্তগুলি ক্রিয়াম্বিত (inoperative), বিপাকী (resultant), সংস্কারজ (volitional) অথবা অসংস্কারজ (automatic) ; লোভ-দ্বেষ-মোহমূলক অথবা অলোভ-অদ্বেষ-অমোহমূলক বা সহেতুক এবং এদের প্রতিক্রিয়া কুশল অথবা অকুশল। কামলোকের ঊর্ধ্বস্থিত রূপ-অরূপ-লোকোত্তর ভূমির চিত্তগুলি ধ্যান বা ভাবনাময় এবং এদের প্রতিক্রিয়া কুশল। আবার লোকোত্তর চিত্তগুলি পার্থিব কুশলাকুশলের অতীত, ক্রিয়াম্বিত ও ফলপ্রসূ। এই পরিচ্ছেদে কামাবচর ভূমির অন্তর্গত বারটি অকুশল চিত্ত তন্মধ্যে আটটি লোভমূলক, দুটি দ্বেষমূলক ও দুটি মোহ মূলক চিত্ত ; আঠারটি অহেতুকচিত্ত তন্মধ্যে সাতটি অকুশলবিপাক (পূর্বজন্মকৃত), আটটি কুশল বিপাক (পূর্বজন্মকৃত), ও তিনটি ক্রিয়াচিত্ত, চব্বিশ রকম শোভন চিত্ত (good consciousness) তন্মধ্যে আটটি কুশল চিত্ত, আটটি সহেতুক বিপাক চিত্ত (পূর্বজন্মকৃত) ও আটটি সহেতুক ক্রিয়াচিত্ত ; পনের রকম রূপাবচর চিত্ত তন্মধ্যে পাঁচটি কুশল, পাঁচটি বিপাক ও পাঁচটি ক্রিয়া চিত্ত ; বার রকম অরূপাবচরচিত্ত তন্মধ্যে চারটি কুশল, চারটি বিপাক ও চারটি ক্রিয়াচিত্ত এবং আট রকম লোকোত্তর চিত্ত তন্মধ্যে চারটি কুশল ও চারটি বিপাক চিত্ত সর্বমোট ঊননব্বই প্রকার চিত্তের আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'চেতসিকসঙ্গহবিভাগে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল চৈতসিক সমূহের শ্রেণী-

বিভাগ। প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত চিত্ত সমূহের কোনটাই একাকী উৎপন্ন হয় না। চিত্তের সঙ্গে যে সকল চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয় তাহাদের বলা হয় চৈতসিক (mental concomitant)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয়, মনসিকার এই সাতটি সর্ব চিত্ত সাধারণ চৈতসিক চিত্ত সমূহের যে কোনটির সঙ্গে উৎপন্ন হতে পারে। অন্যান্য চৈতসিক হচ্ছে ছয় প্রকার প্রকীর্ণ চৈতসিক, যথা—বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ বীর্য, প্রীতি ও ছন্দ ; চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিক, যথা—মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা (পাপকর্মে ভয়হীনতা), ঔদ্ধত্য, লোভ, দৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য (অস্থিরতা), স্ত্যান, মিদ্ধ ও বিচিকিৎসা, উনিশ প্রকার শোভন সাধারণ চৈতসিক শ্রদ্ধা, স্মৃতি, অপত্রপা, হ্রী, অলোভ, অদ্বেষ, তত্রমধ্যস্থতা (balance of mind), কায়প্রশ্রব্ধি (কায়িক প্রশান্তি), চিত্ত-প্রশ্রব্ধি, কায়লঘুতা, চিত্তলঘুতা, কায়মৃদুতা, চিত্তমৃদুতা, কায়কর্মণ্যতা, চিত্তকর্মণ্যতা, কায়প্রগুণতা (দক্ষতা), চিত্তপ্রগুণতা, কায়ঋজুতা ও চিত্তঋজুতা , তিন প্রকার বিরতি, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম ও সম্যক্ আজীব ; দুপ্রকার অপ্রমেয় চৈতসিক : করুণা ও মুদিতা এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক। এই পরিচ্ছেদে সর্বমোট বাহান্ন প্রকার চৈতসিকের আলোচনা আছে এবং এই সকল চৈতসিক চিত্তের সঙ্গে কিভাবে সংযোজিত হয় তা' বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'পকিন্নকসঙ্গহ বিভাগে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল সুখ বেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা, অথবা সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, উপেক্ষা ইত্যাদি চৈতসিক ভেদে চিত্তের সংখ্যা নির্ণয় এবং উননব্বই প্রকার চিত্তের উপরোক্তরূপ বেদনা ; লোভ-দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ ইত্যাদি, হেতু, প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, আবর্তন (পালি আবজ্জন), দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, সম্প্রতীচ্ছ (ইচ্ছাকারী চিত্ত), সন্তীরণ (লক্ষণ বিচার), ব্যবস্থাপন, জবন (বেগ), তদালম্বন ও চ্যুতি—এই চৌদ্দ প্রকার কৃত্য বা কার্য ; চক্ষুদ্বার, শ্রোত্রদ্বার, ঘ্রাণদ্বার, জিহ্বাদ্বার, কায়দ্বার ও মনোদ্বার—এই ছয়-দ্বাররূপ-শব্দ গন্ধ-রস-স্পর্শ-ধর্ম (চিন্তন) —এই ছয় প্রকার আলম্বন ; চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায় বাস্তু (base) এবং হৃদয় বাস্তু এই ছয় প্রকার বাস্তু সংগ্রহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'বীথিসঙ্গহবিভাগে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল কামাবচরাদি ভূমিভেদে ও পুদ্গল বা ব্যক্তিভেদে চিত্তবীথির (চিত্তের ভ্রমণপথ) আলোচনা। চক্ষু-শ্রোত্রাদি পঞ্চদ্বার পথে আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গ অবস্থা থেকে চিত্ত জাগ্রত হয়ে নির্দিষ্ট কৃত্যাদি সমাপন করে পুনরায় ভবাঙ্গে পতিত হয়। চিত্তপরম্পরায় এই সমস্ত কার্য সম্পাদনই চিত্তের বীথিভ্রমণ বা চিত্তবীথি এবং এরূপ বীথিতে উৎপন্ন চিত্তপরম্পরাই বীথিচিত্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 'বীথিমুত্তসঙ্গহবিভাগের' প্রতিপাদ্য বিষয় হল কোন প্রতিসন্ধিক্ষণের (জন্মমুহূর্ত) পরবর্তী ক্ষণ থেকে সেই জন্মের চ্যুতিক্ষণ (মৃত্যু) পর্যন্ত বীথিমুক্ত প্রতিসন্ধিচিত্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বীথিচিত্তোৎপত্তির অনুপস্থিতিতে নদীস্রোতের মত প্রবাহিত হতে থাকে যার অপর নাম ভবাঙ্গস্রোত। বীথিমুক্ত চিত্তসংগ্রহের আলোচ্য বিষয় চতুর্বিধ : (১) চতুর্বিধ ভূমি যথা—(ক) নিরয়লোক, তির্যকযোনি, প্রেতবিষয় ও অসুরকায় নিয়ে অপায়ভূমি ; (খ) মনুষ্য-লোক, চাতুর্মহারাজিক দেবলোক, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোক, যাম দেবলোক, তুষিতদেবলোক নির্মাণ-রতিদেবলোক ও পরনির্মিতবশবর্তীদেবলোক নিয়ে কামসুগতিভূমি ; (গ) ব্রহ্মা পারিষদ, মহাব্রহ্মা, আভস্বর, শুভাকীর্ণ ইত্যাদি ষোল প্রকার স্তর নিয়ে রূপাবচর ভূমি ;

(১) আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, অকিঞ্চনায়তন ও নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন নিয়ে অরূপাবচরভূমি।

(২) চতুর্বিধ প্রতিসন্ধি, যথা—অপায় প্রতিসন্ধি, কামসুগতি প্রতিসন্ধি, রূপাবচর প্রতিসন্ধি ও অরূপাবচর প্রতিসন্ধি।

(৩) চতুর্বিধকর্ম, যথা—কৃত্যানুসারে কর্ম, প্রতিসন্ধিক্ষণে ফলপ্রদানের পর্যায়ানুসারে কর্ম, প্রবর্তনে ফলপ্রদানের কালানুসারে কর্ম ও ফল প্রদানের স্থান অনুসারে কর্ম।

(৪) চতুর্বিধ মরণোৎপত্তি, যথা—আয়ুক্ষয়, কর্মক্ষয়, আয়ুকর্ম উভয়ের যুগপৎ ক্ষয় ও ব্যাধি প্রভৃতি উপচ্ছেদক কর্মের ফলে মৃত্যু।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'রূপসঙ্গহবিভাগের' প্রতিপাদ্য বিষয় হল রূপের শ্রেণীবিভাগ, রূপোৎপত্তির ক্রম ও নির্বাণ। এই পরিচ্ছেদের 'রূপসমুদ্দেস' অংশে রূপের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চার মহাভূত এবং মহাভূতোৎপন্ন রূপ গুণানুসারে আটাশ প্রকারে বিভক্ত, যথা—পৃথিবী-ধাতু, আপধাতু তেজধাতু, বায়ুধাতু, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য, স্ত্রীভাব, পুংভাব, হৃদয়বাস্তু, জীবিতেন্দ্রিয়, কবলীকৃত আহার, আকাশধাতু, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্‌-বিজ্ঞপ্তি, লঘুতা মৃদুতা, কর্মণ্যতা, উপচয়, সন্ততি, জরতা ও অনিত্যতা। 'রূপবিভাগ' অংশে আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, বাস্তু, অবাস্তু, দ্বার, অদ্বার, ইন্দ্রিয়, অনিন্দ্রিয়, সপ্রতিঘ, অপ্রতিঘ, স্থূল, সূক্ষ্ম, উপাদিন্ন, অনুপাদিন্ন, দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, গোচরগ্রাহী, অগোচরগ্রাহী, বিনিভাজ্য, ও অবিনিভাজ্য রূপের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'রূপসমুট্‌ঠান' অংশে রূপের সমুত্থানের (রূপের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার উৎপত্তি) কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে কর্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার। 'রূপকলাপবিভাগ' অংশে চক্ষুদশক, শ্রোত্রদশক ইত্যাদি নয় প্রকার কর্মসমুত্থানকলাপ (অর্থাৎ যে সকল রূপ একসঙ্গে উৎপন্ন হয় ও একসঙ্গে নিরোধ প্রাপ্ত হয়), ছয় প্রকার চিত্ত সমুত্থান কলাপ, চার প্রকার ঋতু সমুত্থান ও দু প্রকার আহার সমুত্থান-কলাপের বর্ণনা আছে। 'রূপপ্পবত্তিক্কম' অংশে কামলোক, রূপলোক ও অসংজ্ঞসত্ত্বলোকে যে সকল সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তনকালীন রূপের উৎপত্তিক্রম বিবৃত হয়েছে। সর্বশেষে 'নিব্বান' অংশে লোকোত্তর নির্বাণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ 'সমুচ্চয়সঙ্গহ বিভাগের' প্রতিপাদ্য বিষয় হল সংখ্যাবদ্ধভাবে রূপ ও অরূপের নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগ। এই পরিচ্ছেদে 'অকুশল সংগ্রহে' চৌদ্দটি অকুশল চৈতসিককে তাদের স্বভাব অনুসারে নয়টি গুচ্ছে বিভক্ত করা হয়েছে। 'মিশ্রসংগ্রহে' লোভ-দ্বেষাদি ছয় হেতু, বিতর্ক-বিচারাদি সাত ধ্যানাঙ্গ, সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক্‌ সঙ্কল্পাদি দ্বাদশ মার্গাঙ্গ, চক্ষু শ্রোত্রাদি, বাইশটি ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাদি নয় বল, ছন্দাদি চার অধিপতি, চার প্রকার আহার, সাত প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং 'সর্বসংগ্রহ' অংশে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু ও চতুরার্যসত্যের বর্ণনা আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ 'পচ্চয়সঙ্গহবিভাগে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি ও প্রস্থাননীতি (পট্‌ঠাননয়)। এই পরিচ্ছেদে অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ইত্যাদি দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং হেতু, আলম্বনাদি চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় বা কার্যকারণ সম্পর্কের বর্ণনা আছে।

নবম পরিচ্ছেদ 'কম্মট্‌ঠানসঙ্গহবিভাগে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল শমথ ও বিদর্শন ভাবনার দ্বারা চিত্ত ও জ্ঞানের বিশুদ্ধি সাধন ও বিমুক্তিলাভ। এখানে ধ্যান বা ভাবনার বিভিন্ন কর্মস্থান বা আলম্বনগুলি উল্লিখিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি অনূদিত **অভিধর্মার্থসংগ্রহ**।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অভিধম্মাবতার (অভিধর্মাবতার)—ইহা আচার্য বুদ্ধদত্ত রচিত অভিধর্মবিষয়ক সারগ্রন্থ। গ্রন্থের নামের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অভিধর্মে অবতরণ বা প্রবেশ। ইহা ভিক্ষুদের

অভিধর্মবিষয়ে শিক্ষার এবং অধ্যাপনার এইটি হস্তসার (hand-book) বিশেষ। অভিধম্মাবতারকে ত্রিপিটক বহির্ভূত অভিধর্মবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম বলা যায়। ইহা অথসালিনী অথবা সম্মোহবিনোদিনীর মত টীকা গ্রন্থ নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থবির অনুরুদ্ধ কর্তৃক **অভিধম্মত্থসঙ্গহ** রচনার পূর্বে **অভিধম্মাবতারকে** মৌলিক রচনারূপে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

অভিধম্মাবতারে চব্বিশটি পরিচ্ছেদ আছে। তন্মধ্যে ষোলটি পদ্যে, একটি সম্পূর্ণ গদ্যে এবং অবশিষ্ট সাতটি গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত। প্রথম পরিচ্ছেদ 'চিত্তনিদ্দেসের' প্রতিপাদ্য বিষয় হল উননব্বইটি চিত্তের (state of consciousness) বিশ্লেষণ ; তন্মধ্যে রয়েছে একুশটি কুশলচিত্ত, বারটি অকুশলচিত্ত ; ছত্রিশটি বিপাকচিত্ত ও বিশটি ক্রিয়াচিত্ত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'চেতসিক নিদ্দেসে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল বিভিন্ন চিত্তের সহজাত বিভিন্ন চৈতসিকের (mental concomitant) বর্ণনা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'চেতসিকবিভাগ-নিদ্দেসের' আলোচ্য বিষয় হল একশ একুশটি চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন চৈতসিকের পরিচয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'একবিভাগাদিনিদ্দেসে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'কুশল, অকুশল ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনের (চিত্তের) আলোচনা। পঞ্চম পরিচ্ছেদ 'চিত্তুপ্পত্তি-নিদ্দেসে'র প্রতিপাদ্য হল ভূমি ও ব্যক্তিভেদে (পুদ্গল) চিত্তগুলির শ্রেণীবিভাগ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'আরম্মনবিভাগনিদ্দেসে' চিত্তগুলির বিভিন্ন আলম্বনের (object) বর্ণনা রয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদ 'বিপাকপবত্তিনিদ্দেসে' বিপাকচিত্তের উৎপত্তি ও স্থিতির বিষয় আলোচিত হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদ 'পকিণ্ণকনিদ্দেসে' মনে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপস্থিতির ফলে চিন্তনের প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। নবম পরিচ্ছেদ 'পুঞ্ঞবিপাকপচ্চয়নিদ্দেসের' প্রতিপাদ্য বিষয় হল কুশল এবং অকুশলচিত্তের গঠন, প্রতিসন্ধিগ্রহণের পর বিভিন্ন ভূমিতে বত্রিশপ্রকার বিপাকচিত্তের উপস্থিতি ও প্রত্যয় বর্ণনা। দশম পরিচ্ছেদ 'রূপবিভাগনিদ্দেসে' রূপের বিশ্লেষণ এবং একাদশ পরিচ্ছেদ 'নিব্বাননিদ্দেসে' পরমনির্বাণের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 'পঞ্ঞত্তিনিদ্দেসে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হল প্রজ্ঞপ্তি (connotation)। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 'কারকপটিবেধনিদ্দেসের' আলোচ্য বিষয় হল কার্যকারণ ব্যাখ্যা এবং সমস্ত কর্ম ও কর্মফলের কর্তা বলে অবিনশ্বর আত্মাকে অস্বীকার। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 'রূপাবচর-সমাধিভাবনানিদ্দেসের' এবং পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ অরূপাবচরসমাধিভাবনানিদ্দেসের' আলোচ্য বিষয় হল যথাক্রমে রূপাবচর চিত্ত ও অরূপাবচরচিত্তের সমাধি (concentration)। ষোড়শ পরিচ্ছেদ 'অভিঞ্ঞানিদ্দেসে' বর্ণিত হয়েছে পঞ্চাভিজ্ঞা বা পাঁচটি অলৌকিক ক্ষমতা। যেমন দিব্যচক্ষুর দ্বারা সত্ত্বগণের কর্মানুযায়ী বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ জানতে পারা যায়। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 'অভিঞ্ঞারম্মণনিদ্দেসে' উপরোক্ত অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 'দিট্ঠিবিসুদ্ধিনিদ্দেসে' প্রজ্ঞাভাবনা ব্যাখ্যাত হয়েছে। উন-বিংশতি পরিচ্ছেদ 'কঙ্খাবিতরণবিসুদ্ধিনিদ্দেসে' সন্দেহ মুক্তির উপায় বর্ণিত হয়েছে। বিংশতিপরিচ্ছেদ 'মগ্গামগ্গঞাণদস্সনবিসুদ্ধিনিদ্দেসে' যথার্থ মার্গ ও কুমার্গ বিষয়ে জ্ঞান-দর্শনবিশুদ্ধি আলোচিত হয়েছে। একবিংশতি পরিচ্ছেদ 'পটিপদাঞাণদস্সনবিসুদ্ধিনিদ্দেসে' উপরোক্ত জ্ঞানদর্শনবিশুদ্ধির উপায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ 'ঞাণদস্সনবিসুদ্ধি-নিদ্দেসে' জ্ঞানদর্শনবিশুদ্ধিমার্গের চার প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ 'কিলেসপহান-কথা'য় চিত্তের উপক্লেশ দূরীকরণের এবং বোধিজ্ঞানলাভের পূর্বে পরিজ্ঞানপ্রহান উপলব্ধি ও মানসিক ভাবনার কথা বর্ণিত হয়েছে। চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ 'পচ্চয়নিদ্দেসে' চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় বা কার্যকারণ সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে।

প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে গাথার মাধ্যমে দুঃখ ও পুনর্জন্ম নিরোধ করতে অভিধর্ম-চর্চার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থশেষে গাথায় আচার্য বুদ্ধদত্ত বলেছেন যে কাবেরীপত্তনে পূর্ব প্রাসাদে বাস করার সময় ভিক্ষু সুমতির অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পূর্বপ্রাসাদ ছিল কৈলাস শিখর সদৃশ উচ্চ এবং কোন এক কৃষ্ণদাস এইটি প্রস্তুত করেছিলেন। সম্ভবত এই পূর্বপ্রাসাদবিহার ও মহাবংসে উল্লিখিত কেলাসবিহার অভিন্ন। এই গ্রন্থরচনা ঘিরে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতে বলা হয়েছে যে আচার্য বুদ্ধঘোষ সিংহল যাত্রাকালে আচার্য বুদ্ধদত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অনুরোধ করেন যেন তিনি (বুদ্ধদত্ত) তাঁর (বুদ্ধঘোষ) অনূদিত পালি অর্থকথার সারাংশ রচনা করেন। তদনুসারে আচার্য বুদ্ধদত্ত সমগ্র অভিধর্ম অর্থকথার সারাংশ হিসেবে অভিধম্মাবতার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (দ্রষ্টব্য : *Buddhadatta's Manual*, p. XIX)।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অভিধম্মপিটক (অভিধর্মপিটক)

অভিধর্ম ত্রিপিটকের তৃতীয় বিভাগ। আচার্য বুদ্ধঘোষের **অথসালিনী** গ্রন্থানুযায়ী 'অভি' উপসর্গের অর্থ অধিকতর। সুতরাং সূত্রাতিরিক্ত ধর্মই অভিধর্ম। যা সূত্রে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, অভিধর্মে তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ, বিভাজন ও ব্যাখ্যা করে আলোচনা করা হয়েছে। অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় ৪টি—চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ অর্থাৎ রূপও অরূপ। সমগ্র অভিধর্ম শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্মের বিশ্লেষণ, ধর্মসমূহের লক্ষণ বিচার ও শ্রেণীকরণ এবং পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য বিষয় নীতির উপর নির্ভরশীল ও মনোবিজ্ঞানসম্মত। বুদ্ধঘোষ বৈজ্ঞানিক বিভাজন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত অভিধর্মকে 'নয় সাগর' বলে অভিহিত করেছেন। অভিধর্ম পিটক সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত—

(১) **ধম্মসঙ্গণি** (২) **বিভঙ্গ** (৩) **ধাতুকথা** (৪) **পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি**
(৫) **কথাবত্থু** (৬) **যমক** (৭) **পট্ঠান**

অভিধর্ম ও সূত্রের মধ্যে বিষয়বস্তুগত প্রভেদ নেই, পার্থক্য আছে বিষয়-বিন্যাস ও উপস্থাপনা রীতিতে। সূত্রে যা দেশিত হয়েছে, অভিধর্মে তা বিশেষভাবে বিভাজন ও বিশ্লেষণ করে সম্যক নিরূপিত এবং প্রমাণিত করা হয়েছে। সূত্রের ভাষাকে বলা হয়েছে 'বোহার বচন' বা ব্যাবহারিক ভাষা। অভিধর্ম হল 'পরমত্থ বচন' বা পরমার্থিক বচন। সূত্রের ভাষায় আবেগ, উচ্ছ্বাস আছে, প্রয়োজনমত উদান, গাথা বেয্যাকরণ, সমবধান আছে, সর্ব সাধারণের প্রয়োজনে প্রাচীন আখ্যান, দেববিমান, প্রেতলোক বর্ণনা আছে ; পরম সুখ, পরম শান্তি নির্বাণ আছে। কিন্তু অভিধর্ম কেবল মননশীলতার পরাকাষ্ঠা। ইহা বিশ্লেষণাত্মক, বিভাজনশীল, পর্যবেক্ষণধর্মী এবং নৈর্ব্যক্তিক। এজন্য অভিধর্ম দুরবগাহ।

ধম্মসঙ্গণি—ইহা অভিধর্ম পিটকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ইহা ধর্মের লৌকিক ও লোকোত্তর বিষয়ের গণনা। 'কামাবচর রূপাবচরাদিধম্মে সঙ্গয়্হ সংখিপিত্বা বা গণয়িত সংখ্যাতি এত্থাতি ধম্মসঙ্গণি'। ধম্মসঙ্গণিতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমস্ত বিষয় শ্রেণীভাগ করে পর্যবেক্ষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইহার আলোচ্য বিষয় হল—চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। গ্রন্থটি তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে চিত্ত ও ৫২টি চৈতসিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২য় ভাগে রূপের বা জড়ের বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। বিকারশীল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পদার্থই অভিধর্মে 'রূপ' নামে অভিহিত। ৩য় ভাগের নাম নিক্খেপ—এই অংশে পূর্বে আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা

হয়েছে। গ্রন্থটিতে পুনরাবৃত্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। সমার্থক শব্দ দ্বারা বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বের কিছু সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করার নীরস প্রচেষ্টাও হয়েছে। ইহার ভাষারীতি উপমা ও রূপক বর্জিত। পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, দীর্ঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্ত এবং মিলিন্দ পঞ্‌হের কিছু কিছু বিষয় ধম্মসঙ্গণিতেও পাওয়া যায়। যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বিসুদ্ধিমগ্গেও তা আলোচিত হয়েছে। সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের 'সঙ্গীতি-পর্যায়পাদ'-এর সঙ্গে এই গ্রন্থের মিল দেখা যায়। আচার্য বুদ্ধঘোষ 'অত্থসালিনী' নামে ধম্মসঙ্গণির টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।

বিভঙ্গ—সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে গ্রন্থটি সংগ্রথিত। গ্রন্থটিতে অষ্টাদশ অধ্যায়। আলোচ্য বিষয়—খন্ধ বিভঙ্গ, আয়তন বিভঙ্গ, ধাতু বিভঙ্গ, সচ্চবিভঙ্গ, ইন্দ্রিয় বিভঙ্গ, পচ্চয়াকারবিভঙ্গ, সতিপট্ঠান বিভঙ্গ, সম্মপ্পধানবিভঙ্গ, সিক্খাপদবিভঙ্গ, পটিসম্ভিদাবিভঙ্গ, ঞানবিভঙ্গ, খুদ্দকবত্থুবিভঙ্গ এবং ধম্মহদয়বিভঙ্গ। প্রথম তিনটি অধ্যায়—খন্ধ, আয়তন ও ধাতুবিভঙ্গ একাধারে ধম্মসঙ্গণির পরিপূরক এবং ধাতুকথার ভিত্তিভূমি। ধম্মসঙ্গণিতে আলোচিত হয়নি এমন বহু সংজ্ঞা ও নাম বিভঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের তিনটি অংশ—(১) সুত্তন্ত-ভাজনীয় (২) অভিধম্ম-ভাজনীয় এবং (৩) পঞ্‌হপুচ্ছক বা প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে আলোচনাবিধি। বুদ্ধঘোষ 'সম্মোহ-বিনোদিনী' নামে বিভঙ্গের অট্ঠকথা রচনা করেন। 'সম্মোহবিনোদনীলীনত্থ' নামে ইহার অনুটীকাও পাওয়া যায়। সর্বাস্তিবাদীদের অভিধর্মে বিভঙ্গ গ্রন্থ 'ধর্মস্কন্ধ' নামে অভিহিত।

কথাবত্থু—খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ইহার ২৩টি অধ্যায়ে ২২৬টি ধর্মমত খণ্ডন করা হয়েছে। সর্বাস্তিবাদী অভিধর্ম পিটকে এই গ্রন্থ 'বিজ্ঞানপদ' নামে পরিচিত। ইহা বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক বিতর্ক-গ্রন্থ এবং ধম্মসঙ্গণির পরে সঙ্কলিত। পণ্ডিতগণের মতে কথাবত্থু সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে সংগ্রথিত হয়েছে। বলা হয় কথাবত্থু সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতির সভা-সঞ্চালক মহাস্থবির মোগ্গলিপুত্ত তিস্স কর্তৃক রচিত। মহাবংশে এই সঙ্গীতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। অনুমান করা যায় অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং স্থবিরবাদিগণকে অধিকার চ্যুত করে অন্যান্য সম্প্রদায় সম্প্রসারিত হয়ে উঠেছিল। এমনকি পাটলিপুত্র বৌদ্ধবিহার যাহা স্থবিরবাদীদের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল সেখানেও স্থবিরবাদী আচার আচরণ প্রায় অবলুপ্ত হয়ে এসেছিল। সম্রাট অশোক ছিলেন স্থবিরবাদের একান্ত সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি সঙ্ঘে শৃঙ্খলারক্ষা এবং সদ্ধর্মের স্থিতিকরণের জন্য তৃতীয় মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেন। মহাসঙ্গীতিতে স্থিরীকৃত হল বুদ্ধ স্থবিরবাদী বা বিভজ্জবাদী ছিলেন এবং স্থবিরবাদীদের তত্ত্বই প্রকৃত সদ্ধর্ম। অতপর মহাস্থবির মোগ্গলিপুত্ত কথাবত্থু রচনা করেন এবং এই গ্রন্থে তিনি স্থবিরবাদের প্রতিপক্ষ অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের অভিমত খণ্ডন করেন। অবশ্যই অন্য কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই সঙ্গীতির কার্যবিবরণীতে অংশগ্রহণ করেননি। বুদ্ধের পরবর্তী বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনার উপাদানরূপে কথাবত্থুর বিশেষ স্থান আছে। ইহা সে যুগের ধর্মীয় অবস্থার উপরও বিশেষ আলোকপাত করে। আচার্য বুদ্ধঘোষ **কথাবত্থুপকরণের** অট্ঠকথা রচনা করেন।

পুগ্গলপঞ্ঞত্তি—অভিধর্মপিটকের এই চতুর্থ গ্রন্থ সর্বাস্তিবাদীদের অভিধর্ম গ্রন্থের তালিকায় 'প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র' নামে অভিহিত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ১০টি অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পুদ্গল ও ব্যক্তি বিশেষের সম্পর্কে ব্যবহারিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের

রচনাকাল জানা যায়নি, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় গ্রন্থটি নিকায়সমূহের পরে সঙ্কলিত হয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে—

(১) ছয় নাম, (২) এক দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ পুদ্গল,
(৩) দুই দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ পুদ্গল, (৪) তিন দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ পুদ্গল,
(৫) চার " " ", (৬) পাঁচ " " ",
(৭) ছয় " " ", (৮) সাত " " ",
(৯) আট " " ", (১০) নয় " " ",
(১১) দশ " " "।

'পুদ্গল' অর্থ ব্যক্তি বা লোক; ইহা শ্রেণী বা দলের বিপরীত। **পুগ্গলপঞ্ঞত্তি অট্‌ঠকথায়** পঞ্ঞত্তি অর্থ হল ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রদর্শন, প্রতিষ্ঠা, বিশদ বর্ণনা ইত্যাদি। পঞ্ঞত্তি ছয় প্রকার—পঞ্ঞাপনা, দেসনা, পকাসনা, ঠপনা, এবং নিক্খিপনা (designations, indications, expositions, affirmations and depositions etc.)। **পুগ্গলপঞ্ঞত্তি** গ্রন্থে **অঙ্গুত্তরনিকায়ের** রচনা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। কেবল রচনা রীতিই নয়, বিষয়বস্তুও **দীঘনিকায়ের সঙ্গীতি সুত্ত** এবং **অঙ্গুত্তর নিকায়ের** সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সঙ্কলিত। আলোচনা প্রসঙ্গে সেখ, অর্হৎ, প্রত্যেকবুদ্ধ, সম্মাসম্বুদ্ধ, সদ্ধানুসারী, ধম্মানুসারী, সোতাপন্ন, সকদাগামী, অনাগামী প্রমুখ ৫০ প্রকারের পুদ্গলের উল্লেখ করা হয়েছে।

ধাতুকথা

ধাতুকথা বা সর্বাস্তিবাদীদের **'ধাতুকায়পাদ'** অভিধম্ম পিটকের ৫ম গ্রন্থ। ইহাকে ধম্মসঙ্গণির পরিপূরক গ্রন্থও বলা যায়। বিভঙ্গে আলোচিত খন্ধ, আয়তন ও ধাতু ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে নানাভাবে এবং নানা প্রণালীতে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৪টি অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে রচিত। খন্ধ, আয়তন ও ধাতু সম্পর্কে বিশদ আলোচনা থাকায় গ্রন্থটির নাম খন্ধ-আয়তন-ধাতুকথা হওয়া উচিত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহার আলোচ্য বিষয়—পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু, চারি সতিপট্‌ঠান, চারি আর্য সত্য, চারি ধ্যান, পঞ্চ বল, সপ্ত বোজ্ঝঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

যমক—

যমক শব্দের অর্থ যুগল বা যুগ্ম। পরস্পর বিরোধী কথার সমাবেশে রচিত বলে গ্রন্থটির নাম হয়েছে 'যমক'। **যমক** গ্রন্থের ১০টি অধ্যায়। যথা—(১) মূল যমক—ইহার আলোচ্য বিষয় কুশল ও অকুশল ধম্ম এবং তাদের মূল। (২) খন্ধ যমক—পঞ্চ স্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। (৩) আয়তন যমক—দ্বাদশ আয়তন—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ ইত্যাদি। (৪) ধাতু যমকের আলোচ্য অষ্টাদশ ধাতু। (৫) সচ্চ যমক—চারি আর্য সত্য (৬) সংখার যমক—আলোচ্য ত্রিসংস্কার (৭) অনুসয় যমকের আলোচ্য বিষয় কামরাগ, দিট্‌ঠি, বিচিকিচ্ছা, মান, ভবরাগ এবং অবিজ্জা। (৮) চিত্তযমক—চিত্ত ও চৈতসিক (৯) ধম্মযমক—কুশল ও অকুশল ধম্ম। (১০) ইন্দ্রিয় যমক—দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়। সর্বাস্তিবাদীদের অভিধর্ম পিটকে যমকের প্রতি-গ্রন্থ হল 'প্রকরণপাদ'। স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রশ্ন যুগল এবং তার নিশ্চয়ার্থক উত্তর অতি সুস্পষ্টভাবে যমকে উপস্থাপিত হয়েছে। কোনও প্রকার দ্বার্থ বা কাল্পিতার্থ যাতে আরোপ করা না যায় সেজন্য এই রচনারীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের অট্‌ঠকথা **যমক-পকরণ-অট্‌ঠকথা** বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত।

পট্ঠান

অভিধর্মের সপ্তম এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। **পট্ঠান** শব্দের অর্থ প্রধান কারণ। অভিধর্মের এই বিশাল গ্রন্থকে মহাপ্রকরণও বলা হয়। সর্বাস্তিবাদীদের **অভিধর্মপিটকে** এই গ্রন্থ 'জ্ঞানপ্রস্থান' নামে অভিহিত। নামরূপের পরস্পর সম্পর্ক বা কারণ নির্ণয় করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কার্যকারণ নির্ণয়ের দু'টি পদ্ধতি—প্রতীত্যসমুৎপাদরীতি ও পট্ঠান রীতি। প্রতীত্যসমুৎপাদে যা দ্বাদশ নিদানাকারে বা অবয়বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পট্ঠান রীতিতে তা চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়াকারে বিশদ প্রমাণসহ প্রমাণিত ও বর্ণিত হয়েছে। পট্ঠানে ৪টি প্রধান বিভাগ—অনুলোম পট্ঠান, পচ্চনিয় পট্ঠান, অনুলোম-পচ্চনিয় পট্ঠান, পচ্চনিয়-অনুলোম পট্ঠান। এই ৪টি বিভাগে ২৪টি প্রত্যয়ের প্রয়োগ ৬ প্রকারে প্রদর্শিত হয়েছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ ভিক্ষু চুল্ল বুদ্ধঘোষের অনুরোধে 'পট্ঠানপকরণঅট্ঠকথা' নামে ইহার টীকা গ্রন্থ রচনা করেন।

সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে অভিধর্মের তত্ত্ব অধিকতর আলোচিত। ব্রহ্মদেশে কেবল বৌদ্ধ বিহারেই নয়, উপাসক উপাসিকাদের গৃহেও অভিধর্ম নিয়মিত পঠিত ও আলোচিত হয়। অভিধর্ম শিক্ষার্থীকে প্রথমে অভিধর্মের সার সংগ্রহ 'অভিধম্মাত্থসংগহ' পড়তে দেওয়া হয়। আচার্য অনুরুদ্ধ অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের ৭টি অভিধর্ম গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার **'অভিধম্মত্থসংগহ'** রচনা করেন। এই গ্রন্থে চিত্ত, চৈতসিক রূপ ও নির্বাণ—এই চারিটি পরম পদার্থের আলোচনা স্থান পেয়েছে। (চিত্ত ৮৯ প্রকার, চৈতসিক ৫২, রূপ ২৮ এবং নির্বাণ ১।) এই প্রসঙ্গে অনুরুদ্ধের পূর্ববর্তী আচার্য বুদ্ধদত্তের 'রূপারূপ বিভাগ' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে অভিধম্মত্থসংগহের কয়েকটি টীকা গ্রন্থও রচিত হয়। যথা বিমলবুদ্ধি বিরচিত পোরাণ-টীকা', সুমঙ্গলের **'অভিধম্মত্থ-বিভাবনী'** সদ্ধম্ম জোতিপালের **'সংখেপ বণ্ণনা'** এবং লেডী সায়াদ-এর **'পরমত্থ-দীপনী।'**

Reference :

Dhammasangani—E. Muller, P. T. S., London ; *Vibhanga*—Mrs Rhys Davids, P. T. S., London ; *Kathāvatthu*—A. C. Taylor, 2 Vol, P. T. S., London ; *Puggalapaññatti*—R. R. Morris, P. T. S. London ; *Yamaka*—Mrs. Rhys Davids, 2 Vol, P. T. S, London ; *Dhātukathā*—E. R. Gooneratne, P. T. S. London ; *Patthāna*—Rhys Davids, P. T. S, London ; *A History of Pali Literature*, 2 Vols.—B. C. Law, Bharatiya Publishing House. Varanasi ; *A Manual of Abhidhamma*, Narada Mahathera, Budhist Publication Society, Sri Lanka ; অভিধর্মার্থসংগ্রহ, অনু. বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি

আশা দাশ

অভিধর্মকোশ—আচার্য বসুবন্ধু (খৃঃ ৫ম শতক) বিরচিত অভিধর্মকোশ-কারিকা এবং অভিধর্মকোশ-ভাষ্য উভয়ের একত্রীভূত নাম অভিধর্মকোশ বা অভিধর্মকোশ-শাস্ত্র। মূলতঃ বসুবন্ধুর সময়ে কাশ্মীর অঞ্চলে বৈভাষিক সম্প্রদায়ের নিকট যে অভিধর্ম শাস্ত্র প্রচলিত ছিল তাকে ভিত্তি করেই এই অভিধর্মকোশ রচিত হয়েছে। মহাবিভাষা বা বিভাষাই অভিধর্ম-কোশের আকরগ্রন্থ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ তৎকালে মহাবিভাষা বা বিভাষাই ছিল বৈভাষিক বা সর্বাস্তিবাদীদের প্রামাণ্য অভিধর্মশাস্ত্র (**বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'অভিধর্ম-মহাবিভাষা।'**)। কারিকা-অংশে বসুবন্ধু বৈভাষিকদের অভিধর্মশাস্ত্র

সহজবোধ্য সংস্কৃতভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যে সকল স্থানে তাঁর মতের সঙ্গে মিল হয়নি সেই সেই স্থানে তিনি 'কিল' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ বসুবন্ধু নিজে বৈভাষিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সৌত্রান্তিক। আর ভাষ্য-অংশে বহুবিষয়ে বৈভাষিকদের কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন—যেমন, অবিজ্ঞপ্তি রূপের স্বভাব, চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ, কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম, দ্রব্যসত্য, অতীত এবং অনাগত বস্তুধর্মের অস্তিত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে। পণ্ডিত যশোমিত্র অভিধর্মকোশ ভাষ্যের ব্যাখ্যা (স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা) রচনা করে অভিধর্মকোশের প্রতিপাদ্য বিষয় আরও প্রাঞ্জল করেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই ব্যাখ্যার মূল সংস্কৃতগ্রন্থ অবিকৃতাকারে পাওয়া গিয়েছে। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে যশোমিত্র-বিরচিত ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক মূল্য সর্বাধিক। পরবর্তীকালে (খৃঃ ১৯৩৪, ১৯৩৬) অভিধর্মকোশ ভাষ্যের ও কারিকার মূল সংস্কৃত-পাণ্ডুলিপি তিব্বত থেকে উদ্ধার করেছেন পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। কারিকাংশের সম্পাদনা করেছেন বি. বি. গোখেল মহোদয় যা ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে (JBRAS, Vol. 22, 1946) এবং ভাষ্যের সম্পাদনা করেছেন প্রহ্লাদ প্রধান মহোদয় (K.P. Jayaswal Research Institute, Patna, 1967)। স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যার সম্পাদনা বহু পূর্বেই করেছেন জাপানের পণ্ডিত U. Wogihara মহোদয় (Tokyo, 1932-1936)।

অভিধর্মকোশের কারিকা-সংখ্যা ৫১৮, মতান্তরে ৬০০। ইহা ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত, যেমন ধাতুনির্দেশ, ইন্দ্রিয়—°, লোক—°, কর্ম—°, অনুশয়—°, পুদ্গলমার্গ—°, জ্ঞান—°, সমাপত্তি—°,। সর্বশেষে যুক্ত হয়েছে একটি অধ্যায় যাহা গদ্যে বিরচিত। এই অধ্যায়ের নাম পুদ্গলবিনিশ্চয়। এতে সাংখ্য, বৈশেষিক এবং বাৎসীপুত্রীয়দের শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ক মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে।

ধাতুনির্দেশে কারিকা সংখ্যা ৪৮। যদিও এই অধ্যায়ের নাম ধাতুনির্দেশ তথাপি এতে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতু সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। বিশেষতঃ সর্বাস্তিবাদিসম্মত ৭৫ প্রকার ধর্ম এখানে আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে অসংস্কৃত ৩ প্রকার (আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং অপ্রতিসংখ্যানিরোধ) এবং সংস্কৃত ৭২ প্রকার (রূপ ১১ + চিত্ত ১ + চৈত্ত ৪৬ + চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ধর্ম ১৪)। **ইন্দ্রিয়নির্দেশে** কারিকা সংখ্যা ৭৩। এতে ২২ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আছে। এতদ্ব্যতীত ধর্মসমূহের স্বভাব ও ক্রিয়া এতে আলোচিত হয়েছে। ছয়প্রকার হেতু, চারিপ্রকার প্রত্যয় এবং পাঁচপ্রকার ফল বিষয়ে আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। **লোকনির্দেশে** কারিকা সংখ্যা ১০২। বিভিন্ন লোক বা জগত সম্বন্ধে আলোচনা এর বিষয়বস্তু। লোক প্রধানতঃ দ্বিবিধ—সত্ত্বলোক এবং ভাজনলোক। সত্ত্বলোকের তিনটি স্তর—কামধাতু, রূপধাতু এবং আরূপ্যধাতু। আবার গতি হিসাবে পঞ্চ গতি—নরক, প্রেত, তির্যক, মনুষ্য এবং দেব। যোনি হিসাবে চারি যোনি—অণ্ডজ, জরায়ুজ, উপপাদুক এবং সংস্বেদজ। ভব চারিপ্রকার—উপপত্তিভব (জন্মক্ষণ), পূর্বকালভব (জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যুক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত), মরণভব (মৃত্যুক্ষণ) এবং অন্তরাভব (মৃত্যুক্ষণ থেকে জন্মক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত)। ভাজনলোকে ভৌগোলিক এবং জ্যোতির্বিদ্যার দিক দিয়ে জগতের বর্ণনা আছে। সত্ত্বলোকের বিভিন্ন সত্ত্বের আয়ু ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতু নিয়ে এই জগৎ সৃষ্ট। কিভাবে জগতের সৃষ্টি হয় কিভাবে এর ধ্বংস হয় ইত্যাদি সম্যগ্‌ভাবে আলোচিত হয়েছে। **কর্মনির্দেশে** কারিকা সংখ্যা ১২৭। বিভিন্ন প্রকার কর্মের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যও আলোচিত হয়েছে। স্থূলভাবে কর্ম দ্বিবিধ—চেতনা কর্ম (= মনঃকর্ম) এবং চেতয়িত্বা কর্ম (=কায়কর্ম

এবং বাক্‌কর্ম)। অতএব, মূলত কর্ম ত্রিবিধ—কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম এবং মনঃকর্ম। কায় এবং বাক্‌কর্মের সহিত সূক্ষ্মভাবে রূপকর্মের অস্তিত্বও আছে যাকে বলা হয় অবিজ্ঞপ্তিকর্ম। এই অবিজ্ঞপ্তিকর্ম তিনপ্রকার—সংবর, অসংবর এবং নৈবসংবরনাসংবর। এদের মধ্যে প্রথমটিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রাতিমোক্ষ, ধ্যান এবং অনাস্রব। পরে আলোচিত হয়েছে কিভাবে অবিজ্ঞপ্তিকর্মের উৎপত্তি, বৃদ্ধি এবং নিবৃত্তি সাধিত হয়। শেষে দশ কুশল এবং দশ অকুশল কর্মপথ বর্ণিত হয়েছে। দশ অকুশল কর্মপথের কারণ হচ্ছে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ। দশ কুশল কর্মপথের কারণ হচ্ছে অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ। কুশলাকুশল সকল কর্মপথই তিনপ্রকার ফল উৎপন্ন করে—অধিপতিফল, নিষ্যন্দফল এবং বিপাকফল। সর্বশেষে বোধিসত্ত্বের সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ছয়প্রকার পারমিতা পূর্ণ করতে পারলে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন। এই ছয়প্রকার পারমিতা হ'ল—দানপারমিতা, শীল—°, ক্ষান্তি—°, বীর্য—°, ধ্যান—°, এবং প্রজ্ঞা পারমিতা।

অনুশয়নির্দেশে কারিকাসংখ্যা ৭০। এতে সর্বমোট ৯৮ প্রকার অনুশয়ের কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। অনুশয় শব্দের অর্থ হচ্ছে চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা। চিত্তের মালিন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধানতঃ অনুশয় ৬ প্রকার—রাগ, প্রতিঘ, মান, অবিদ্যা, দৃষ্টি এবং বিচিকিৎসা। ৫ প্রকার দৃষ্টিভেদে অনুশয়ের সংখ্যা ১০। কামধাতু, রূপধাতু এবং আরূপ্যধাতুভেদে ১০ প্রকার অনুশয় সর্বসাকুল্যে ৯৮ প্রকার। এতদ্ব্যতীত ১১ প্রকার সর্বত্রগ এবং ৯ প্রকার উর্ধ্ববিষয় অনুশয়ও আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষে আগমসূত্রের ন্যায় আস্রব, ওঘ, যোগ, উপাদান, সংযোজন, বন্ধন, উপক্লেশ, পর্যবস্থান এবং মল আলোচিত হয়েছে। **পুদ্গলমার্গনির্দেশে** কারিকাসংখ্যা ৭৯। এতে সর্ববিধ ক্লেশ দূরীকরণের উপায় নির্দেশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে দর্শনমার্গ, ভাবনামার্গ এবং অশৈক্ষমার্গ। প্রথম দু'টি মার্গের দ্বারা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামিমার্গ ও ফল এবং অর্হত্ত্বমার্গ লাভ করা যায়। অশৈক্ষমার্গের দ্বারা অর্হত্ত্বফল লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত এতে চারি প্রতিপদ, চারি স্মৃত্যুপস্থান, চারি সম্যক্ প্রহাণ, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, অষ্টমার্গ এবং চারি অবেত্যপ্রসাদবিষয়ে আলোচনা আছে। **জ্ঞাননির্দেশে** কারিকাসংখ্যা ৫৬। ১০ প্রকার জ্ঞান আলোচিত হয়েছে—দুঃখজ্ঞান, সমুদয়জ্ঞান, নিরোধজ্ঞান, মার্গজ্ঞান, ধর্ম—°, অন্বয়—°, ক্ষয়—°, অনুৎপাদ—°, পরচিত্ত—° এবং সংবৃতি—°। ইহা ব্যতীত আছে বুদ্ধের দশবল, চারি বৈশারদ্য, তিন স্মৃত্যুপস্থান, মহাকরুণা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা। বুদ্ধের কোন্ কোন্ গুণাবলীর সঙ্গে আর্যপুদ্গলদের গুণাবলী এবং পৃথগ্‌জনদের গুণাবলীর সাদৃশ্য আছে তাও আলোচিত হয়েছে। **সমাপত্তিনির্দেশে** আছে ৪৩টি কারিকা। এতে বিবিধ প্রকারের সমাধি-বিষয়ের বিস্তৃত পর্যালোচনা আছে—যেমন, চারি ধ্যান, চারি আরূপ্য, অষ্ট সমাপত্তি প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত আছে তৎতৎ সমাধিপ্রসূত বিভিন্ন প্রাপ্তির কথা—যেমন, চারি অপ্রমাণ, অষ্ট বিমোক্ষ এবং অষ্ট **অভিভ্বায়তন**। সর্বশেষ অধ্যায় **পুদ্গল-বিনিশ্চয়ে** আছে শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক মতবাদের খণ্ডন। প্রমাণ করা হয়েছে যে ধর্মসমূহ নৈরাত্ম্য। পুনর্জন্ম স্বীকৃত, কিন্তু শাশ্বত আত্মা স্বীকৃত নহে।

দ্রষ্টব্য—
১। অভিধর্মকোশ, পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বারাণসী, বিক্রম সংবৎ, ১৯৮৮। ২। অভিধর্মকোশ-ভাষ্য, প্রহ্লাদ প্রধান, পাটনা, ১৯৬৭। ৩। অভিধর্মকোশম্, স্বামী দ্বারিকাপ্রসাদ শাস্ত্রী, বারাণসী, ১৯৭০। ৪। Sukomal Chaudhuri, *Analytical Study of the Abhidharmakośa*, Calcutta, 1976.

সুকোমল চৌধুরী

অভিধর্ম-মহাবিভাষা—এর সংক্ষিপ্ত নাম মহাবিভাষা বা বিভাষা যা বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ। 'বিভাষা' নাম থেকেই সম্প্রদায়ের নাম হয়েছে 'বৈভাষিক'। সম্রাট কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রন্থ কাশ্মীরে রচিত হয়েছিল। রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারও মতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৫০০ বৎসর পরে এটা রচিত হয়েছিল, অন্য কারও মতে ৪০০ বৎসর পরে, অন্য কারও বা মতে ৬০০ বৎসর পরে। তবে সম্রাট কনিষ্কেরই প্রচেষ্টার ফলে যে এই মহাগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছিল এ বিষয়ে বিমত নেই। কনিষ্ক যখন কাশ্মীর-গন্ধার অঞ্চলের অধিপতি তখন তিনি বৌদ্ধধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষকরূপে খ্যাত। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের ভিন্নভিন্ন মতাদর্শ দেখে তিনি অস্বস্তিবোধ করছিলেন। পরে পণ্ডিত পার্শ্বের উপদেশে তিনি কাশ্মীরে একটি মহাবিহার নির্মাণ করেন। সেই মহাবিহারেই তিনি ৫০০ অর্হৎ স্থবিরদের আহ্বান করে ভগবান বুদ্ধের ধর্মবাণীর সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে রচিত হয় উপদেশ-শাস্ত্র (= সূত্রপিটক) যার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ, বিনয়-বিভাষা (= বিনয়পিটক), যার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ এবং অভিধর্ম-বিভাষা (= অভিধর্মপিটক) যার শ্লোকসংখ্যাও এক লক্ষ। পরে এই তিনটি মহাগ্রন্থকে তাম্রফলকে ক্ষোদিত করে একটি স্তূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

অভিধর্ম-মহাবিভাষা মূলতঃ সর্বাস্তিবাদী অভিধর্মপিটকের প্রধান গ্রন্থ **"জ্ঞান-প্রস্থানের"** (কাত্যায়নী পুত্র-বিরচিত) বিভাষা বা ব্যাখ্যা। তবে যে যে বিষয়ে জ্ঞানপ্রস্থানে ন্যূনতা ছিল সেই সেই বিষয় সর্বাস্তিবাদীদের অন্য ছয়টি অভিধর্মগ্রন্থ থেকে নিয়ে মহাবিভাষাকে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধর্ম গ্রন্থের রূপ দান করা হয়েছিল। ঐ ছয়টি গ্রন্থ হচ্ছে স্থবির বসুমিত্র বিরচিত **প্রকরণপাদ,** স্থবির দেবশর্মা-বিরচিত **বিজ্ঞানকায়,** আর্য শারিপুত্র-বিরচিত **ধর্মস্কন্ধ,** আর্য মৌদ্গল্যায়ন-বিরচিত **প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র,** স্থবির পূর্ণ-বিরচিত **ধাতুকায়** এবং স্থবির মহাকৌষ্ঠিল-বিরচিত **সঙ্গীতিপর্যায়**। ক্রমে এই অভিধর্ম-মহাবিভাষাই সর্বপ্রধান অভিধর্মগ্রন্থরূপে মর্যাদা লাভ করে। সমগ্র ভারতবর্ষে তখন এরই পঠন-পাঠন ব্যাপক হয়েছিল। কারণ তখন পালি অভিধর্ম গ্রন্থাবলী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই অভিধর্ম-মহাবিভাষাকেই ভিত্তি করে আচার্য ধর্মোত্তর রচনা করেছেন **অভিধর্মহৃদয়,** আচার্য ধর্মত্রাত রচনা করেছেন **সংযুক্তাভিধর্মহৃদয়,** আচার্য বসুবন্ধু রচনা করেছেন **অভিধর্মকোশ,** এবং আচার্য সঙ্ঘভদ্র রচনা করেছেন **অভিধর্মন্যায়ানুসার** এবং **অভিধর্মসময়-প্রদীপিকা।**

আটটি গ্রন্থ বা অধ্যায়ে মহাবিভাষা রচিত—প্রকীর্ণকগ্রন্থ, সংযোজনগ্রন্থ, জ্ঞানগ্রন্থ, কর্মগ্রন্থ, চতুর্মহাভূতগ্রন্থ, ইন্দ্রিয়গ্রন্থ, সমাধিগ্রন্থ এবং দৃষ্টিগ্রন্থ। প্রত্যেকটি গ্রন্থ আবার কতকগুলি বর্গে বিভক্ত। যেমন প্রকীর্ণকগ্রন্থে আটটি বর্গ আছে, যথা লোকোত্তরধর্মবর্গ, জ্ঞানবর্গ, পুদ্গল—°, প্রেম-গৌরব—°, আহ্রীকা-অনপত্রাপ্য—°, রূপ—°, অনর্থ—°, এবং চেতনাবর্গ। সংযোজন গ্রন্থে বর্গসংখ্যা ৪, যথা অকুশল-বর্গ, সকৃদাগামী—°, পুদ্গল—° এবং দশোপায় বা দশদ্বার—°। জ্ঞানগ্রন্থে বর্গসংখ্যা ৫, যথা, শিক্ষাঙ্গবর্গ, পঞ্চবিষয়—°, পরচিত্ত জ্ঞান—°, ভাবনা জ্ঞান—° সপ্ত আর্যপুদ্গল—°। কর্মগ্রন্থে বর্গসংখ্যা ৫, যথা—দুশ্চরিত বর্গ, মিথ্যাভাষণ°, প্রাণীহিংসা—°, বিজ্ঞপ্তি-অবিজ্ঞপ্তি—° এবং স্বচরিত্র—°। চতুর্মহাভূতগ্রন্থে বর্গসংখ্যা ৪, যথা—মহাভূতবর্গ, প্রত্যয়—°, সম্যগ্‌দর্শন—° এবং স্মৃতি—°। ইন্দ্রিয় গ্রন্থে বর্গসংখ্যা ৭, যথা—ইন্দ্রিয়বর্গ, ভব—°, স্পর্শ—°, সর্বসাধারণচিত্ত—°, একচিত্ত—°, মৎসা (= মাৎসর্য) বর্গ এবং হেতুপ্রত্যয়—°। সমাধি গ্রন্থে বর্গসংখ্যা ৫, যথা—প্রাপ্তি বর্গ, প্রত্যয়°, সংগ্রহ—°, অনাগামী—°, এবং এতাবচেক—°। দৃষ্টিগ্রন্থে বর্গসংখ্যা ৫, যথা স্মৃত্যুপস্থান বর্গ, ত্রিভব—°, সংজ্ঞা—°, জ্ঞান—° এবং দৃষ্টিবর্গ।

অভিধর্ম-মহাবিভাষার মূল সংস্কৃতগ্রন্থ বিলুপ্ত হয়েছে। তবে হিউয়েন্-সাঙ্ কৃত (খৃঃ ৬৫৬-৬৫৯) পূর্ণাঙ্গ চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায়। চীনা, কোরিয়া এবং জাপানী ভাষায় এর বহু টীকা-টিপ্পনী রচিত হয়েছে।

1. J. Takakusu, *The Abhidharma Literatare of the Sarvāstivādins*, JPTS, 1904-35 2. Kao Kuan ju, *Abhidharmamahāvibhāṣā*. EB, Fasc, A-Aca, pp. 80-84.

সুকোমল চৌধুরী

অভিধর্মবিজ্ঞানকায়পাদ—সর্বাস্তিবাদী অভিধর্মপিটকের ৭টি গ্রন্থের মধ্যে একটি। **বিজ্ঞানকায়** বা **বিজ্ঞানকায়পাদ** নামেই ইহা সর্বাধিক পরিচিত। ইহার রচয়িতা স্থবির দেবশর্মা। রচনাকাল বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে প্রথম শতকের মধ্যে। সংস্কৃত, চীনা ও তিব্বতী উৎস এই বিষয়ে একমত। হিউয়েন-সাঙের মতে অযোধ্যার কোনও এক মঠে (মতান্তরে শ্রাবস্তীর বিশোক বিহারে) স্থবির দেবশর্মা ইহা রচনা করেন। পরে ইহা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচারিত হয় এবং সর্বাস্তিবাদীদের অভিধর্মপিটকে স্থান লাভ করে। ইহার মূল সংস্কৃত বিলুপ্ত হয়েছে। তবে ইহার চীনা অনুবাদ পাওয়া যায়। অনুবাদক হিউয়েন্-সাঙ্ (খৃঃ ৬৪৯)।

এই গ্রন্থের ৬টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে আছে পুদ্গল, ইন্দ্রিয়, চিত্ত, ক্লেশ, বিজ্ঞান, বোধ্যঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে স্থবির মৌদ্গল্যায়নের অভিমত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে অস্ট পুদ্গল, ষট্ বিজ্ঞানকায়, চারি স্মৃত্যুপস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা। তদুপরি আছে পুদ্গলবাদ ও শূন্যবাদ বিষয়ে আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম হেতুপ্রত্যয়। ইহাতে আছে বিভিন্ন প্রকার চিত্তের বর্ণনা এবং অতীতের বিজ্ঞানকায় সমূহের বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম আলম্বনপ্রত্যয়। ইহাতেও বিভিন্ন চিত্তের বর্ণনা আছে। তৎসহ অতীতের কুশলাকুশল কর্ম বিষয়ে আলোচনা আছে। পঞ্চম অধ্যায়ের নাম প্রকীর্ণক। ইহাতে আছে ষট্‌বিজ্ঞানকায়, দৃষ্টিহেয় ও ভাবনাহেয় দ্বিবিধ চিত্ত, অষ্টাদশ ধাতু ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম সমন্বাগম। ইহাতে আছে শৈক্ষ, অশৈক্ষ, চিত্তের সমন্বাগম, অসমন্বাগম ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা।

অভিধর্মবিভাষাশাস্ত্র—যদিও অভিধর্ম মহাবিভাষা ও অভিধর্মবিভাষা মূলতঃ একই তথাপি অভিধর্মবিভাষাশাস্ত্র নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় যার রচয়িতা আচার্য কাত্যায়নী পুত্র। খৃষ্টীয় ৫ম শতকের গোড়ার দিকে আচার্য বুদ্ধবর্মা ও আচার্য তাও-তাই কর্তৃক চীনা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ থেকেই এই নামটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। মূল বিলুপ্ত। ইহা ৮টি গ্রন্থ এবং ৪৭ বর্গে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ৪৩৯ খৃষ্টাব্দে চীনে উত্তর লিয়াং ও ওয়েইর সহিত যুদ্ধের সময় ইহা বিনষ্ট হয়। পরবর্তীকালে ইহার ৩টি গ্রন্থ এবং ১৬টি বর্গ মাত্র উদ্ধার করা হয়েছে। প্রথমে একটি ভূমিকা আছে। তার পরে মূল গ্রন্থ সুরু হয়েছে। প্রথম গ্রন্থে ৮টি বর্গ, যথা—লোকোত্তরধর্ম বর্গ, জ্ঞান—°, পুদ্গল°, প্রেম-গৌরব—°, আহ্রীকা-অনপত্রাপ্য—°, রূপ—°, অনর্থ—°, চেতনা—°। স্থবির বকুল, বুদ্ধদেব ইত্যাদির নাম এখানে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম সংযোজনগ্রন্থ। এতে চারিটি বর্গ, যথা—অকুশল বর্গ, সকৃদাগামী—°, পুদ্গল—° এবং দশ-দ্বার—°। এতে স্থবির পার্শ্ব, মহাকোষ্ঠিল ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। তৃতীয় গ্রন্থের নাম জ্ঞানগ্রন্থ। এতে চারিটি বর্গ যথা—অষ্টমার্গ বর্গ, পরচিত্ত জ্ঞান—°, ভাবনা-জ্ঞান° এবং সম্প্রযোগ—°। তুলনীয়ঃ **অভিধর্ম মহাবিভাষা**।

১। J. Takakusu, *The Abhidharma Literature of the Sarvāstivādins*, JPTS' 1904-05.

সুকোমল চৌধুরী

অভিধর্মসমুচ্চয়—রচয়িতা আচার্য অসঙ্গ (খৃঃ ৩১০-৩৯০)। আচার্য অসঙ্গ মহাযান অভিধর্ম-সূত্রের সার সঙ্কলন করে দুইটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি হচ্ছে এই অভিধর্মসমুচ্চয় এবং অপরটি হচ্ছে **মহাযান-সংগ্রহ**। শ্রাবকযান বা হীনযানে অভিধর্ম-গ্রন্থের সংখ্যা অনেক, কিন্তু মহাযানে অভিধর্ম-গ্রন্থ দুর্লভ। সেই দিক দিয়ে অভিধর্মসমুচ্চয়ের গুরুত্ব অনেক। তা ছাড়া মহাযানীরা মনে করেন যে, যথার্থ অভিধর্মগ্রন্থের মধ্যে চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে—১। নির্বাণ উপলব্ধির জন্য আর্যমার্গের উপস্থাপনা ; ২। ধর্মসমূহের সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা ; ৩। বিরুদ্ধ মতবাদসমূহকে খণ্ডন করার পক্ষে যুক্তিসমূহের উপস্থাপনা এবং ৪। মূলগ্রন্থের অর্থাববোধের জন্য ব্যাখ্যার অবতারণা। বস্তুতপক্ষে অভিধর্মসমুচ্চয়ে এই চারিটি বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। এই গ্রন্থে ১৫০০ শ্লোক আছে। এর ৫টি ভাগ আছে। প্রথম ভাগের নাম **লক্ষণসমুচ্চয়**। এতে স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। এদের লক্ষণ, সংগ্রহ, সম্প্রযোগ এবং সমন্বাগম বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে মহাযানের মূলনীতি বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে। শ্রাবকযানী অভিধর্ম-গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় যে ধর্মসমূহের অস্তিত্বকে প্রতিপাদন করাই এদের লক্ষ্য। কিন্তু অভিধর্মসমুচ্চয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সর্বধর্মশূন্যতার উপলব্ধি। দ্বিতীয় ভাগের নাম **সত্যবিনিশ্চয়**। এতে দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য আর্য মার্গ—এই চারি প্রকার সত্যের সম্যক্ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। তৃতীয় ভাগের নাম **ধর্মবিনিশ্চয়**। এতে দ্বাদশাঙ্গযুক্ত বুদ্ধশাসনের (বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের) বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। চতুর্থ ভাগের নাম **প্রাপ্তিবিনিশ্চয়**। এতে আছে বিভিন্ন প্রকার পুদ্গলের বর্ণনা যারা অভিসময় (=শুদ্ধ জ্ঞান) চর্চায় নিপুণ ও পারদর্শী। পঞ্চম ভাগের নাম **সাংকথ্যবিনিশ্চয়**। এতে আছে সূত্রসমূহে নিবদ্ধ ধর্ম ও দর্শনকে বিশ্লেষণ করার ছয় উপায়।

বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ **অভিধর্মসূত্র** এখন বিলুপ্ত। **মহাযানসংগ্রহ** গ্রন্থ থেকেও উক্ত সূত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু অভিধর্মসমুচ্চয় সেই অভাব দূর করেছে। এতে অভিধর্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই কারণেই অভিধর্মসমুচ্চয় পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

আচার্য অসঙ্গের শিষ্য বুদ্ধসিংহ অভিধর্মসমুচ্চয়ের উপর ভাষ্য রচনা করেন এবং পরে আচার্য স্থিরমতি মূল ও ভাষ্যের উপর ব্যাখ্যা রচনা করেন যার মূল সংস্কৃত তিব্বতে রক্ষিত আছে। এর নাম **অভিধর্মসমুচ্চয়ব্যাখ্যা**। হিউয়েন-সাঙ্ চীনাভাষায় অভিধর্মসমুচ্চয়ের অনুবাদ করেন ৭ম শতকে। পরে ইহার তিব্বতী অনুবাদ করেন আচার্য জিনমিত্র। এই অনুবাদকার্যে তাঁর সহায়ক ছিলেন আচার্য শীলেন্দ্রবোধি ও আচার্য জ্ঞানসেন। তিব্বতী ও চীনা উভয় অনুবাদই এখন পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় **অভিধর্মসমুচ্চয়ের** মূল সংস্কৃত বিনষ্ট হয়েছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বত থেকে এর কিছু কিছু মূল সংস্কৃত উদ্ধার করেছেন যা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বি. বি. গোখেল প্রকাশিত করেছেন *JBRAS*, Vol. 23, 1947, pp. 13-38)। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক প্রহ্লাদ প্রধান চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ থেকে বিলুপ্ত অংশগুলিকে সংস্কৃতে পুনরনুবাদ করে পূর্ণাঙ্গ **অভিধর্মসমুচ্চয়** সম্পাদিত ও প্রকাশিত করেছেন (*Visva-Bharati Studies*, Vol. 12, 1950)। **অভিধর্মসমুচ্চয়ভাষ্য** ও **অভিধর্মসমুচ্চয়ব্যাখ্যার**ও একাধিক তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ পাওয়া যায়। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন অভিধর্মসমুচ্চয়ভাষ্যেরও একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি তিব্বত থেকে উদ্ধার করেছেন। আচার্য যশোমিত্রও **অভিধর্মসমুচ্চয়ের** উপর একটি ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন।

অভিধর্মসমুচ্চয় যোগাচার সম্প্রদায়ের অভিধর্ম গ্রন্থ হলেও বিষয়বস্তুর দিক বিচার করলে স্থবিরবাদী বা সর্বাস্তিবাদী অভিধর্মপিটকের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

Ref.: ১। P. Pradhan, Abhidharmasamuccaya of Asanga, Visva Bharati Series, Vol. 12, 1950.

সুকোমল চৌধুরী

অভিধর্মসার—ইহা **অভিধর্মহৃদয়শাস্ত্র** নামে সমধিক পরিচিত। সর্বাস্তিবাদী অভিধর্মপিটকের সারবস্তু ইহাতে সঙ্কলিত হয়েছে। আচার্য ধর্মশ্রী খৃষ্টীয় ২০০ অব্দে অভিধর্মহৃদয়শাস্ত্র (=অভিধর্মসার) রচনা করেন। পণ্ডিতগণের মতে এই গ্রন্থখানিই সর্বাস্তিবাদীদের মতবাদসংক্রান্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ। ৩৯১ খৃঃ ইহার চীনা অনুবাদ করেন সঙ্ঘদেব এবং হুই-ইউয়েন। ভূমিকা বাদে এতে ১০টি অধ্যায় আছে, যথাক্রমে (১) ধাতু, (২) সংস্কার, (৩) কর্ম, (৪) অনুশয়, (৫) আর্যপুদ্গল, (৬) জ্ঞান, (৭) সমাধি, (৮) সূত্র, (৯) প্রকীর্ণক এবং (১০) বিচার। আচার্য উপশান্ত (মতান্তরে উপাজিত) ইহার টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। এই টীকাগ্রন্থের নাম **অভিধর্মহৃদয়সূত্র** (নামান্তর, **ধর্মোত্তর-অভিধর্ম-হৃদয়-শাস্ত্র**)। উত্তর শী-বংশের জনৈক নরেন্দ্রযশঃ ৫৬৩ খৃঃ ইহার অনুবাদ করেন চীনা ভাষায়। এতেও ১০টি অধ্যায়। তবে 'বিচার' অধ্যায়টি এখানে নেই। আচার্য ধর্মত্রাত ৩৫০ খৃঃ রচনা করেন **সংযুক্ত-অভিধর্ম-হৃদয়-শাস্ত্র।** ইহারও চীনা অনুবাদ করেন সঙ্ঘবর্মা এবং আরও কয়েকজন ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে। এতে ১১টি অধ্যায় আছে। তবে একাদশ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত দুইটি গ্রন্থে পাওয়া যায়না। Ref. ১। *Encyclopaedia of Buddhism, 'abhidharmasāra'.*

সুকোমল চৌধুরী

অভিধানপ্পদীপিকা—

সংস্কৃত অমরকোষের আদর্শে পালিভাষায় রচিত **অভিধানপ্পদীপিকা** একখানি মূল্যবান কোষগ্রন্থ। এই গ্রন্থটি অনুরাধপুরের অন্তর্গত জেতবন বিহারবাসী মোগ্গল্লান স্থবির ১৬৯৬ বুদ্ধাব্দে বা ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। ইঁনি শ্রীলঙ্কার রাজা (প্রথম) পরাক্রমবাহুর (১১৬৪ খৃঃ অঃ—১১৯৭ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক ছিলেন। অনেকে গ্রন্থকর্তাকে বৈয়াকরণ মোগ্গল্লানের সহিত অভিন্ন বলে মনে করেন। আবার কারো কারো মতে এরা দুজন আলাদা ব্যক্তি। পালি শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্থ করবার সুবিধার জন্য গ্রন্থটি ছন্দোবদ্ধ ভাবে লিখিত হয়েছে। ১২০৩ শ্লোক সমন্বিত এই গ্রন্থ সগ্গকণ্ড, ভূকণ্ড ও সামঞ্ঞকণ্ড এই তিন কণ্ডে বিভক্ত। প্রথম সগ্গকণ্ডে কোন বর্গবিভাগ দেখা যায় না। দ্বিতীয় বা ভূকণ্ডে—ভূমি, পুর, নর, চতুব্বন্ন, অরঞ্ঞ ও পাতাল—এই ছয়টি বর্গ রয়েছে। সামঞ্ঞ কণ্ডটি আবার—বিসেসাধীন, সংকিন্ন, অনেকত্থ ও অব্যয়বগ্গ—এই চারিটি বর্গে বিভক্ত। শ্রীলঙ্কা, বর্মা, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে গ্রন্থটি যথেষ্ট সমাদর আজ পর্যন্ত পেয়ে আসছে এবং এর অনেকগুলি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র—

বুদ্ধজীবনী রচনার ক্ষেত্রে **'অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র'** (যা প্রধানতঃ বোধিলাভের উদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ নিয়ে আলোচনা করেছে, কিন্তু যে গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনীয় চীনা ভাষায় রচিত গ্রন্থ *Fu pen-hsing-chi-ching* Nanjio, No. 680); অন্যান্য গ্রন্থ হল—*I-ch'u-p'u-sa-pen-ch'i-ching* (Nanjio, No. ৫০৯); *Hsiu- hsing-pen-ch'i-ching*; Nanjio, No. 664)। *Tai-tz-*

ūshui-ying-pen-ch'i-ching, Nanjio. No. 665 ; এবং *Kuo-chü-hsien-tsai-yin-kuo-ching* ; Nanjio, No. 666) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি লুপ্ত হলেও তার ভাবধারায় রচিত চীনা ভাষায় কয়েকটি অনুবাদের মাধ্যমে গ্রন্থের বিষয় অবগত হওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য : এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় Beal রচিত ঐ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে—*Romantic Legend of Sākya Buddha*)

সূত্রটিতে ষাটটি অধ্যায় আছে যেগুলি Mochizuki (V. 4478) পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। এই অধ্যায়গুলি যথাক্রমে গৌতমবুদ্ধের জন্মের পূর্ব বৃত্তান্ত ও ভূতপূর্ববুদ্ধদের ধারাবাহিক ইতিহাস, শাক্যদের বংশানুক্রমিক ইতিহাস, ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম থেকে প্রথম ধর্মপ্রচার এবং বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেছে। গ্রন্থটিতে **উদান, সুত্তনিপাত, বুদ্ধচরিত** ও অন্যান্য কয়েকটি মহাযান সূত্র থেকে বহু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয় হল এই যে *Fu-pen-hsing-chi-ching*র প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে এ গ্রন্থে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। মহাসাঙ্ঘিকগণ এই গ্রন্থকে বলেন—'*Ta-shih*' ; সর্বাস্তিবাদিদের মতে এর নাম—'*Ta-chuang-yen*' ; কাশ্যপীয়গণ বলেন—'*Fu-wang-yin-yüan*' ; ধর্মগুপ্তদের মতে —'*Shih-chia-mu-ni-fu-pen-hsing*' ; আর মহীশাসকদের মতে নাম হল—'*P'i-ni-tsang-ken-pen*' (অর্থাৎ **বিনয় পিটকের** ভিত্তি)। তবে **অভিনিষ্ক্রমণসূত্র** ধর্মগুপ্তীয়দের মতবাদই মুখ্যভাবে পোষণ করত।

তিব্বতীয় *Kangyur*এ এই নামের একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে (*Mňon-par-ḥbyuṅ-baḥi mdo*)। গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ ও সম্পাদন করেছেন ভারতীয় পণ্ডিত আচার্য ধর্মশ্রীভদ্র ও প্রখ্যাত তিব্বতীয় অনুবাদক Rin-chen-bzaṅ-po.

এ বিষয়ে বিস্তৃততর তথ্যের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : Encyclopaedia of Buddhism (Ceylon, 1961). (*Fas : A-Aca*) পৃঃ, ১৫-১৬।

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অভিরূপা নন্দা—

ইনি কপিলাবস্তুর শাক্যবংশের শাক্য-প্রধান খেমকের কন্যা। অতুলনীয় দেহ-সৌন্দর্যের জন্য তাঁর নাম হয় 'অভিরূপা নন্দা'। পতিনির্বাচনের দিনে যাঁকে তিনি বরণ করতে চেয়েছিলেন সেই শাক্য যুবকের মৃত্যু ঘটে। অপদানে অবশ্য বলা হয়েছে—অনেকে তাঁর পাণিপ্রার্থী হলে মাতাপিতা ঝামেলা এড়াবার জন্য কন্যাকে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রেরণ করেন। (**অপদান**, ২, পৃ. ৬০৯). নন্দা সঙ্ঘে যোগ দান করলেও নিজের সৌন্দর্যের অহঙ্কারে এবং বুদ্ধের তিরস্কারের ভয়ে বুদ্ধের কাছে যেতেন না। বুদ্ধ নন্দার মনোভাব জানতে পেরে সকল ভিক্ষুণীকে ধর্মসভায় পাঠানোর জন্য মহাপ্রজাপতিকে নির্দেশ দেন। নন্দা তাঁর পরিবর্তে অন্য একজনকে ধর্মসভায় প্রেরণ করেন। বুদ্ধ পরিবর্ত বা বদলি ব্যক্তি গ্রহণে অস্বীকৃত হলে নন্দা স্বয়ং ধর্মসভায় বুদ্ধের সম্মুখীন হতে বাধ্য হলেন। বুদ্ধ নন্দার রূপাভিমান খর্ব করার জন্য তাঁর সামনে একটি সুন্দরী নারীকে ক্রমশ রূপহীনা, বিগত যৌবনা বৃদ্ধায় পরিণত করেন। এই দৃশ্য নন্দার মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। ঠিক সময়ে ভগবান অনিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই বিষয় চিন্তা করতে করতে নন্দা অর্হত্ব প্রাপ্ত হন (**পরমত্থদীপনী**, পৃ. ৮১)। 'এ দেহ আতুর, অশুচি, পূতিময় ; সুতরাং বুদ্ধের উপদেশে রূপ ও পদের অভিমান পরিত্যাগ করে ধ্যান কর, চিত্ত প্রশান্ত হবে'—বুদ্ধ দেশিত দু'টি গাথা **থেরী গাথায়** (১৯-২০ নং) নন্দার নামে স্থান পেয়েছে।

আশা দাশ

অভিসময়ালংকারকারিকা—পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার উপর টীকা হল **অভিসময়ালঙ্কার** যার প্রণেতা হলেন মৈত্রেয়নাথ, যিনি যোগাচার-মাধ্যমিক-স্বাতন্ত্রিক-মতাবলম্বী। এই গ্রন্থে ২৭৩টি কারিকা বৃহৎ প্রজ্ঞাপারমিতার সূচীপত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। আনুমানিক ৮ম শতাব্দীতে হরিভদ্র, তার উপর **অভিসময়ালঙ্কারালোক** প্রণয়ন করেন। যে অনুশীলন (practice) **অভিসময়ালঙ্কারে** আছে তা মহাযান পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং থেরবাদানুগামী অনুশীলনের পার্থক্য এখানে স্পষ্ট। এ গ্রন্থে যে মহাযানী পথের কথা বলা হয়েছে তা মূলতঃ প্রজ্ঞা ও শূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'উপদেশ'-শ্রেণীর এই গ্রন্থের সূত্রগুলি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত, আবার তার উপবিভাগ আছে ৭০ এবং বিভাগ আছে ১২০০। E. Conzé'র ভাষায়—'The whole scheme, both in its general plan and in its particular details views everything in its relation to the practical realisation of salvation through wisdom'. আটটি **অভিসময়ের** জন্য ২৭৪টী শ্লোকে রচিত এই গ্রন্থে আটটী অধ্যায় আছে যার মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতার তিনটী অর্থ স্পষ্ট। তারা হল—সর্বাকারজ্ঞতা, মার্গাকারজ্ঞতা, সর্বজ্ঞতা, সর্বাকারাভিসম্বোধ, মূর্ধাভিসময়, অনুপূর্বাভিসময়, একক্ষণাভিসময় ও ধর্মকায়াভিসম্বোধ। এদের মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয়টী হল উপায় (method); চতুর্থ থেকে সপ্তম পর্যন্ত হল পথ, আর অষ্টমটী হল ফল। এ গ্রন্থের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করি এজন্য যে বিমুক্তিসেন ও হরিভদ্রের টীকা সমেত অসংখ্য টীকা এর উপর রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রথমেই গ্রন্থপ্রণয়নের কারণ নির্দেশিত হয়েছে।

তিব্বতীয় অনুবাদে পাল রাজাদের সময় থেকে (৭৫০-১১৫০ খৃঃ) ১৬টী ভারতীয় টীকার উল্লেখ পাওয়া যায় এর মধ্যে ৮টী প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের টীকা, দুটী স্ফুটার্থার উপটীকা আর ৬টী অভিসময়ালঙ্কারের টীকা। Conzé জানান যে এই গ্রন্থের তিব্বতীয় টীকা একাধিক এবং 'The most authoritative of the Tibetan commentaries are Buston's (1319 A.C.). *Luṅ-gi sñe-ma* and *bTsoṅ-kha-pa's* (about 1400A.C.) *Legs-bśed gser phren-ba*'.

মৈত্রেয় বা মৈত্রেয়নাথ (চীনা ভাষায়—'*Mirok*', তিব্বতীয় ভাষায় '*Byams-pahi-mgon-pa*') কর্তৃক বিরচিত অনেক গ্রন্থের মধ্যে **অভিসময়ালঙ্কারকারিকা** তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে ১০৫৯-১১০৯ খৃঃ-র মধ্যে পণ্ডিত অমরগোমী কর্তৃক (দ্রষ্টব্য—Vidyabhusana, *A History of Indian Logic*, পৃঃ ২৬২……)। তিব্বতীয় মতানুসারে এই গ্রন্থ মাধ্যমিকমার্গানুসারী। এই গ্রন্থে তিনি ক্ষণিকত্ববাদ ও শূন্যবাদ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। তার মতে প্রদীপ যেরূপ অন্ধকারের পূর্ববর্তী হয় না আবার তাকে অনুসরণ করে না, সেরূপ আমাদের পূর্ণ জ্ঞান বা বোধি লাভের পূর্বে বা পরে আমাদের চিন্তা প্রবর্তিত হয় না। পদার্থের আট প্রকার প্রকৃতির তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও স্বপ্নোপম।—

পূর্বেণ বোধিধীযুক্তা মনসা পশ্চিমেন বা। দীপদৃষ্টান্তযোগেন গম্ভীরা ধর্মতাষ্টধা ॥
উৎপাদে চ নিরোধে চ তথতায়াং গভীরতা ॥ জ্ঞেয়জ্ঞানে চ চর্য়ায়া মদ্বয়োপায়কৌশলে।
স্বপ্নোপমত্বাদ্ধর্মাণাং ভবশান্ত্যোরকল্পনা ॥ অধ্যায় ৪

বলা হয়েছে যে পদার্থের এ স্বপ্নোপম প্রকৃতির কথা চিন্তা করে আর দানাদি আচরণ করে, কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে সব পদার্থেরই অলক্ষণত্ব; অর্থাৎ তাদের যথার্থভাবে কোন প্রকৃতি নাই। স্বপ্নদর্শন ও দ্রষ্টার অলীকত্ব তাদের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

স্বপ্নোপমেষু ধর্মেষু স্থিত্বা দানাদিচর্য়য়া। অলক্ষণত্বং ধর্মাণাং ক্ষণেনৈকেন বিন্দতি ॥

সত্রভর্দশিনভেদা বরযোগেন নেক্ষতে। ধর্মাধাস্বভাস্তুং ক্ষণেনৈকেন পশ্যতি ॥ অধ্যায় ৭.
এ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বস্তুর জ্ঞান, তার সম্পর্ক ও বিয়োগ সবই ক্ষণিক—

ধর্মজ্ঞানাবরজ্ঞানক্ষান্তিজ্ঞানং ক্ষণাত্মকম্। অধ্যায় ৩।

মৈত্রেয়নাথের **সপ্তদশভূমিশাস্ত্রযোগাচর্য্যার** পঞ্চদশ গ্রন্থে তর্কের পদ্ধতির স্বরূপ সম্পর্কে অতি বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় যা তথ্যসমৃদ্ধ।

Wang Sen বলেন—'This sāstra is so composed that it deals with the *Mahāprajñāpāramitisūtra* entirely from the practical side, viz., the whole process of practising until realising Buddhahood. Therefore it adopts '*Abhisamaya*', meaning 'clear understanding' as its title '*Alaṁkāra*' represents a particular literary style and it also indicates the expositions of truth as it is.'

অভিসময়ালঙ্কার কারিকার উপর বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: G. Tucci, *Abhisamayālaṅkārāloka*, Baroda, 1932; E. Conzé, *Abhisamayalaṅkāra, Serie Orientale Roma* VI. 1954; E. Obermiller, *Analysis of the Abhisamayālaṅkāra*, 1933-43। আরও দ্রষ্টব্য, *Encyclopaedia of Buddhism* এ, Wang Sen ও Conzéর নিবন্ধ, Fas: A-Aca. পৃঃ ১১৪-১১৮; প্রবন্ধ; Fa-tsun; *A brief exposition as the Abhisamayālaṅkāra*, Chungking, 1938.

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অমরপুরনিকায়

উত্তর ব্রহ্মদেশে অবস্থিত অমরপুর নগরের থেরগণ হতে অমরপুর নিকায়ের উৎপত্তি হয়েছে। সিংহলের বৌদ্ধসঙ্ঘে তিনটি প্রধান নিকায়ের মধ্যে অমরপুরনিকায় হচ্ছে উল্লেখযোগ্য (ম, সে, ৪০৬)। ঞাণাভিবংস ধম্মসেনাপতি মহাধম্মরাজাদি রাজগুরু সঙ্ঘরাজ মহাথের ছিলেন এই নিকায়ের প্রধান এবং প্রতিষ্ঠাতা। সিংহল দ্বীপে অমরপুরনিকায়ের ভিক্ষুগণের ছিলেন তিনি আদিআচার্য (শ, ব, ১৮৪)। সিংহলের কাণ্ডির রাজা কীর্তিশ্রী রাজসিংহ (১৭৪৮-৭৮ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধসঙ্ঘের অনুমতি নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে উঁচু বর্ণের লোকেরা ছাড়া কেহই সঙ্ঘে উপসম্পদা নিতে পারবেন না এবং কারও সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার থাকবে না। এর ফলে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিংহলের সলাগম বর্ণের ভিক্ষু-অম্বগহপিটিয়ে প্রভৃতি ছজন ভিক্ষু ব্রহ্মের অমরপুরে গিয়ে রাজা বোদোপয়ের সাহায্যে এবং সঙ্ঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা নিয়েছিলেন। তাঁরা কয়েকজন ব্রহ্ম মহাথেরের সহিত সিংহলে ১৮০২ সালে ফিরে এসে অমরপুরনিকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (ঐ, W: থেবু, ২৩৭)।

ব্রহ্মরাজা মেঙ-দুন-মেঙ (**মিন-ডন-মিন**) এর রাজত্বকালে (১৮৫২-১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) এক সীমার ব্যাপারের বিতর্কে অমরপুরনিকায় দুভাগে ভাগ হয়ে দুদলের ভিক্ষুগণ ব্রহ্মে গিয়েছিলেন। তাঁরা ব্রহ্ম-সঙ্ঘরাজের কাছে শিক্ষা নিয়ে সিংহলে ফিরে এসেছিলেন (শ, ব, ২০৪-২০৫)।

সিংহলে অমরপুরনিকায় প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই ইহা কয়েকটি শাখায় ভাগ হয়ে গেছল। এগুলি হচ্ছে: অমরপুর মূল বংসিক নিকায়, অমরপুরনিকায়, অমরপুরমহানিকায়, অমরপুর দুলগ্রন্থিনিকায়, অমরপুর মূলবংস নিকায়স্থ শ্রীসম্বুদ্ধ শাসনোদয় মহংসঙ্ঘ, সদ্ধম্ম

অমরপুরনিকায়, উদুবট (উভ) অমরপুরনিকায়, উভ অমরপুরনিকায়, উভ-উদুকিণ্ড অমরপুর-নিকায়, অমরপুর সুধম্মনিকায় (ম্রম্ম (রক্ষের) নিকায়), অমরপুর ভাজিরবংসে-নিকায়, অমরপুর শ্রীধর্মরক্ষিত নিকায়, অমরপুর (কল্যানীবংস) নিকায়, অমরপুর-সিরি-সর্বম্মবুত্তিক (মাতর) নিকায়, অমরপুর সিরি ধম্মারাম সধম্মবুত্তিক নিকায়, অমরপুর অরিবংসে সধম্মবুত্তিক নিকায় অমরপুর ম্রম্মবংসোতিধজ সিরি সর্বম্মবুত্তিক নিকায়, অমরপুর সমাগম নিকায়, অমরপুর সদ্ধম্ম-বংস নিকায় এবং শ্বেজি নিকায় (ম. সে, ৪০৬-৪০৮)। প্রত্যেকটি শাখায় একজন করে মহানায়ক ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ নিকায়ের সমস্ত ব্যাপারের তদারক করতেন।

অমরপুরনিকায়ের ভিক্ষু সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। এর এক হাজার পাঁচ শত বিহার ছিল। এই নিকায় কোন বর্ণের বিচার এবং তফাৎ না করে সকলকে উপসম্পদা দিত। এর ভিক্ষুগণ গৃহীদের কাছে বিনয় প্রচার করতেন। তাঁরা চীবর পরে দুটো কাঁধ ঢাকা দিতেন এবং ভুরু কামাতেন না। তাঁরা সারারাত্রিব্যাপী প্রদীপের উৎসবের গুণের উপর জোর দিতেন।

কানাইলাল হাজরা

অমরাবতী

প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর অমরাবতী (১৬°—৩০′ অক্ষাংশে এবং ৮০°—২০′ দ্রাঘিমা) বর্তমানে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামে পর্যবসিত। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণ-তীরে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর জেলার গুণ্টুর শহর থেকে প্রায় ৩৪ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত অমরাবতী শহর। প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্-সাঙ্ (খৃষ্টীয় সপ্তম-শতক) কর্তৃক দৃষ্ট এই শহরটি To-na-kie-tse-kia, প্রাচীন ধনকটক বা ধান্যকটক নামে অভিহিত। বিখ্যাত তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথও ধান্যকটক শহর ও তার চৈত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অমরাবতীতে আবিষ্কৃত উঁচু ঢিবিগুলির অভ্যন্তরে ধান্যকটক নগরীর ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। খৃঃ পূঃ তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ধান্যকটক বৌদ্ধ-শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অমরাবতীতে প্রাপ্ত শিলালেখ এই সত্যকে প্রত্যায়িত করে। এই শিলালেখগুলি মূলতঃ উৎসর্গ-লেখ এবং উষ্ণীষ (coping) ও মহাচৈত্যের বেষ্টনী (railing) ও সূচির (cross-bar) গায়ে ক্ষোদিত। এখানে প্রাপ্ত প্রাচীন শিলালিপিটি (Epigraphica Indica, XXIV) মৌর্যযুগের (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-শতক)। অমরাবতীর মুখ্য স্তূপটি 'মহাচৈত্য' নামে খ্যাত ছিল। মৌর্যসম্রাট অশোকের কালে যে স্তূপটি প্রথম নির্মিত হয় তা খৃঃ পূঃ ২য়—৩য় শতকে অশোক প্রেরিত মহাদেব-থেরের অমরাবতী অঞ্চলে উপস্থিতির দ্বারা প্রমাণিত। এখানে কালো পাথরে উৎকীর্ণ ও মৌর্যপালিশযুক্ত শিলালিপিটি অশোকের কোন স্তম্ভ-শিলালিপির (Pillar Edict) অনুকরণে ক্ষোদিত বলেই অনুমিত। পরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মূলস্তূপের উপর নানাবিধ অলংকরণ ও অঙ্গ-সংযোজন করা হয় এবং মহাচৈত্যটি বেষ্টনীসজ্জার দ্বারা নূতন রূপ লাভ করে। উৎসর্গ লেখগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা সম্প্রদায়ের স্তূপ নির্মাণে বিভিন্ন দানের কথা লিপিবদ্ধ।

ধনকটক সাতবাহন রাজাদের পূর্বপ্রান্তীয় রাজধানীরূপে একসময় প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ করে। তৃতীয় সাতবাহন রাজা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলেন। লেখমালা থেকে জানা যায় যে সাতবাহন নৃপতি পুলমায়ির রাজত্বকালে (আনুমানিক দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতকে) জনৈক উপাসক একটি ধর্মচক্র দান করেন। সাতবাহন

নরপতিগণ যে মহাচৈত্যের নূতন রূপ সংযোজন ও সম্বর্ধনে যথার্থই সাহায্য করেছিলেন তা নিশ্চিত নয়। অনেকের ধারণা এই বিশাল স্তূপের রূপকল্পে ভারহুত ও সাঁচীর মত সাধারণ মানুষের আনুকূল্যই প্রধান ছিল। চৈত্যক এবং মহাসাঙ্ঘিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আরাধ্য বস্তু ছিল অমরাবতীর স্তূপ।

'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' অনুসারে বুদ্ধের দেহাবশেষ এই স্তূপে নিহিত হয়। এই মহাচৈত্যের খ্যাতি বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানের ছাত্র বা শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করেছিল। হিউয়েন-সাঙ্ এ'দের অন্যতম ছিলেন। তাঁর বর্ণনানুসারে তৎকালে সংঘারাম ব্যতীত প্রায় একশত বিভিন্ন দেবদেবীর দেব-মন্দির অমরাবতীর চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক কথায় অমরাবতী ছিল বিভিন্ন ধর্মের এক মিলন-ক্ষেত্র।

পল্লববংশীয় রাজা সিংহবর্মা কর্তৃক **একটি বুদ্ধমূর্তির** প্রতিষ্ঠার কথা ১১০০ **খ্রীষ্টাব্দের একটি** স্তম্ভ-লেখা থেকে জানা যায়। নিকটবর্তী অমরেশ্বরের মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত লিপি রাজা কেত কর্তৃক বুদ্ধের উদ্দেশে তিনটি গ্রামদানের কথা নথিভুক্ত করেছে।

চতুর্দশ শতাব্দীতেও ধান্যকটকের খ্যাতি সমুজ্জ্বল ছিল। সুদূর সিংহল দেশে কান্তী জেলার গদলাদেণীয় লেখে ধান্যকটক উল্লিখিত হয়েছে। এই লিপিতে ধর্মকীর্তি স্থবির কর্তৃক ধান্যকটকের একটি দ্বিতল-দেবায়তন পুনঃসংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ধর্মকীর্তি যে ধান্যকটক বিহারের বুদ্ধ-বিগ্রহের পূজক ছিলেন তার উল্লেখ বিমলকীর্তি বিরচিত **সদ্ধর্ম-রত্নাকর** গ্রন্থে আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে এই বৌদ্ধ পীঠস্থানের বৌদ্ধপ্রভাব অস্তমিত হয় এবং স্থানীয় অমরেশ্বর দেবতার নামানুসারেই অমরাবতীরূপে স্থানটি পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন অমরাবতীর স্তূপের বর্তমানে অলঙ্কারবিহীন মেধিটিই কেবল অবশিষ্ট। পরিকল্পনা-বিহীন খননকার্য, গৃহাদি-নির্মাণের জন্য উপাদান-সংগ্রহ, চুণসম্বলিত মূর্তিগুলি থেকে চুণ-সংগ্রহ প্রভৃতি স্তূপটির ধ্বংসপ্রাপ্তির প্রাথমিক কারণ।

অমরাবতী স্তূপটির স্তূপাবরণ-পাটের (casing slab) অলঙ্করণ উল্লেখযোগ্য। এই অলঙ্করণকার্য স্তম্ভবেষ্টনীর বিভিন্ন অংশ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের দানে যে নির্মিত অমরাবতীর লেখগুলি থেকে জানা যায়। স্তূপ ও বেষ্টনীর গায়ে উদ্গত চিত্র (relief) গুলি শিল্প-বোধের চরম উৎকর্ষ সূচিত করে। স্তূপটির নির্মাণে বিভিন্ন যুগের নিদর্শনও স্পষ্ট। খ্রীঃ পূঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের উদ্গত চিত্রে বুদ্ধ ও বুদ্ধ-জীবনের ঘটনা রূপায়ণে ধর্মচক্র, পদচিহ্ন প্রভৃতি বুদ্ধ-মূর্তির বদলে প্রতীক (symbol) ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরণের প্রতীকী ভারহুত ও সাঁচীস্তূপের ভাস্কর্যে দৃষ্ট। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে স্তূপ ও বেষ্টনীর নবরূপায়ন হয়। তৎকালীন ভাস্কর্যরীতি অনুযায়ী ক্ষোদিত ফলকের পশ্চাদভাগে নূতন করে উদ্গত চিত্র সংযোজিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় প্রথমপর্বে নির্মিত মহাচৈত্যের, আকার, আয়তন ও গঠনশ্রেণীর সুস্পষ্ট কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই। দ্বিতীয়স্তরে (খ্রীষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতকে) সংস্কৃত মহাচৈত্যটির ধ্বংসাবশেষ বিশেষ নেই। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্তূপটির অবশিষ্ট বিভিন্ন অংশফলক ও স্তম্ভ প্রভৃতির নিদর্শন থেকে মহাচৈত্যটির নির্মাণ-পরিকল্পনা, আকার প্রভৃতির মোটামুটি একটি ধারণা করেছেন। স্তূপটির অণ্ড অংশ (dome) প্রায় ২ মিটার উঁচু এবং ৩৯ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট মেধির (drum) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেধির পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ এই চারদিকে এক একটি আয়ক ছিল। প্রতিটি আয়কের উপর পাঁচটি স্তম্ভশ্রেণীর বিন্যাস ছিল। মেধির বহির্ভাগ শুধু ইটের প্রাচীর-দ্বারা আবৃত ছিল। প্রাচীর গাত্রগুলি বিভিন্ন অলংকরণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। আচ্ছাদনের উপরিভাগে উদ্গত-চিত্রে সুসজ্জিত প্রলম্বিত উষ্ণীষ (coping) ছিল।

বড় বড় উদ্গত-চিত্রের বিষয় ছিল জাতক ও বুদ্ধের প্রত্যুৎপন্ন জীবনের কাহিনী। ছোট ছোট উদ্গত-চিত্রের বিষয় হল মিথুন। অণ্ডের প্রলম্বিত অংশটির অলঙ্করণ চুনা পাথরের উর্ধ্বপাট দিয়ে। উর্ধ্বপাটগুলি পরপর তিন থাকে উদ্গত-চিত্রে শোভিত। এগুলির শীর্ষভাগে বিভিন্ন সারি বা থাকে অঙ্কিত হয়েছে জীবজন্তু, ত্রিরত্ন এবং পূর্ণঘট। গোলাকার স্তূপের অণ্ডটি চুণের মোটা প্রলেপে আচ্ছাদিত ছিল বলে অনুমিত। এ-ছাড়া অণ্ডে মালা ও ফুলের প্রতিকৃতির দ্বারা বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। অণ্ডের উপরিভাগে চতুষ্কোণ 'হর্মিকা' বেষ্টনী ছিল। বেষ্টনীর উপরে কেন্দ্রে উড্ডীন ছত্রাবলী ছিল। মেধির ভূমিতে (base) চারিদিকে চুনা পাথরের ফলকে আবৃত প্রদক্ষিণের প্রশস্ত পথ দৃষ্ট। প্রতিটি প্রদক্ষিণ পথের শেষে আয়কমুখী চারটি খাড়া তোরণ দ্বারা ছিল। তোরণদ্বার বেষ্টনীগুলি ভারতীয় শিল্প-কর্মের অনুপম নিদর্শন। এই তোরণগুলি অষ্টকোণী স্তম্ভশ্রেণী, ত্রি-বীথি-সূচিও একটি উষ্ণীষ-সমন্বিত। বেষ্টনীর ভিতর ও বহির্ভাগ উভয়ই অলঙ্কৃত ছিল। ভেতরের বেষ্টনীতে প্রধানতঃ উদ্গত-চিত্রের সাহায্যে জাতক ও বুদ্ধ-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাকেঞ্জী অমরাবতী অঞ্চলের বহু ক্ষোদিত প্রস্তরফলক উদ্ধার করেন। এগুলি প্যারিস, লণ্ডন, মাদ্রাজ, কলিকাতা ও হায়দ্রাবাদের মিউজিয়াম-এ সুরক্ষিত আছে। স্বাধীনোত্তর-যুগে ভারত সরকার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহায়তায় পুনরায় খননকার্য দ্বারা কয়েকটি স্তূপের নীচের অংশ, ইটের প্রাচীর, বজ্রযানীয় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিতে অলঙ্কৃত ভবনের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণের দেহাস্থি, মুক্তা, সোনার ফুল, পুঁতি প্রভৃতিতে পূর্ণ পাঁচটি স্ফটিক-নির্মিত মঞ্জুষা (casket) আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যান্য প্রাপ্ত উপকরণের মধ্যে অলঙ্কৃত-পাট, শিলালেখ, ভগ্ন-স্তম্ভ প্রভৃতি অমরাবতীর পুরাকীর্তি-সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

সাধন সরকার

অমরাবিক্খেপিকা—

ব্রহ্মজালসুত্তে বর্ণিত ৬২ প্রকারের যে সমস্ত প্রচলিত অ-বৌদ্ধ দৃষ্টিবাদ (বুদ্ধশিষ্যদের পরিহারযোগ্য) সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়, এগুলির মধ্যে এ'দের মতবাদ অন্যতম। এই শ্রেণীর মতবাদীরা অমরাবিক্খেপিকা (অমরাবিক্ষেপিকা) নামে অভিহিত হয়েছিলেন এই কারণে যে এ'রা অমরা (বান মাছ) নামক পিচ্ছিলদেহ মাছের মত প্রশ্নের উত্তরকালে সহজ সরল পথ না ধরে কুটিল গতি অবলম্বন করতেন এবং প্রশ্নের কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। এ'রা বাচাবিক্খেপনিকা নামেও পরিচিত ছিলেন ঃ তাঁদের মতবাদ সংশয়বাদ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই মতের অনুসারীরা চার শ্রেণীর। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদীরা যথাযথ জ্ঞানের অভাবে, মিথ্যার ভয়ে কুশলাকুশল প্রশ্নের উত্তর দিতে সংশয় প্রকাশ করতেন ; দ্বার্থ সূচক বাক্য আশ্রয় করে প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর দেওয়া এড়িয়ে যেতেন, কারণ অহঙ্কার, বিদ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির উদ্রেক কিম্বা উপাদান (পুনর্জন্মের কারণ) সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় এবং এ সমস্ত তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর মতবাদীরা জ্ঞানী তার্কিক পণ্ডিতের দ্বারা পরাজিত ও নিন্দনীয় হতে পারেন এবং এর ফলে বিরোধীর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে, যা তাঁদের আধ্যাত্মিক পথের প্রতিকূল স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। একারণে এ'রা অমরা (বান) মাছের গতি অনুসরণ করে এদিক-ওদিক নানাভাবে আঁকাবাঁকা প্রশ্নোত্তর দিতেন। চতুর্থ শ্রেণীর দৃষ্টিবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের (যাঁরা নির্বোধ ও অজ্ঞ) সামনে, 'পরলোক আছে কি নেই' ? 'পরলোক কি একাধারে আছে বা নেই' ? 'মৃত্যুর পরে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, কি থাকে না' ? প্রভৃতি

প্রশ্ন উত্থাপন করলে দ্ব্যর্থ ভাষার আশ্রয় নিয়ে তাঁরা প্রশ্নোত্তর এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। কোন সঠিক উত্তর দিতেন না। এই চার শ্রেণীর এরূপ মতবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অমরামাছের ন্যায় কুটিল গতির আশ্রয় নিয়ে প্রশ্নোত্তরে সংশয় প্রকাশ করতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বুদ্ধের সমসাময়িক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সংশয়বাদী গণাচার্য সঞ্জয় বেলট্‌ঠ-পুত্ত (বা বেলট্‌ঠিপুত্ত ; বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত বৈরাটিপুত্র) এইরূপভাবে প্রশ্নোত্তর দিতেন ; পরলোকের 'অস্তিত্ব নাস্তিত্ব, পাপপুণ্যের ফলাফল, কিংবা মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব' প্রভৃতি প্রশ্নের সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর না দিয়ে বাক্য-বিক্ষেপের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। **(দীঘনিকায়, সামঞ্‌ঞফল-সুত্ত)**

সুকুমার সেনগুপ্ত

অমিতাভ

নেপালের বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে ধ্যানী বুদ্ধ-মণ্ডলের চতুর্থ বুদ্ধ অমিতাভ। ইনি অনন্ত আলোকের প্রতীক ও সুখাবতী নামক বৌদ্ধ-স্বর্গে ধ্যানমগ্ন থাকেন। ইনি শাক্যমুনি বুদ্ধের আকাশীয় (ethereal) প্রতীক। থেরবাদ বৌদ্ধগ্রন্থে এঁ'র উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিমী-বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের (Northern Buddhist) গ্রন্থ এঁ'র বর্ণনা ও উল্লেখ আছে। ইনি ভদ্রকল্পের প্রধান ধ্যানী বুদ্ধ। সৃষ্টি-ক্রিয়ায় ইনি সংযুক্ত থাকলেও তৎসৃষ্ট বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের উপরই সৃষ্টিকর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত। ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খৃঃ) বা হিউয়েন্-সাঙ্ (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ) তাঁদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর ও মঞ্জুশ্রীর উল্লেখ করলেও অমিতাভ-ধ্যানী বুদ্ধের উল্লেখ করেন নি। আচার্য বসুবন্ধু (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) অমিতাভ-বুদ্ধের অনুরক্ত ছিলেন। Charles Eliot এর মতে (*Hinduism and Buddhism* Vol. II. 29) অমিতাভ ভারতীয় চিন্তাধারায় উদ্ভূত নন। তাঁর মতে খৃষ্টযুগের সূচনাতেই এশিয়া মহাদেশের কোন অংশে অমিতাভ-পূজা ও ধর্মমতাদর্শ (cult) জীবন্ত ও প্রচলিত হয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মধ্য এশিয়াবাসী কোন এক পণ্ডিত চীনা-ভাষায় অমিতাভ-বিষয়ক মূল সূত্র অনূদিত করেন। সম্ভবতঃ ধ্যানী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের ধারণা হিমালয়ের উত্তর অঞ্চলে প্রচলিত হওয়ার সময় চীনদেশে অমিতাভের ধ্যান-ধারণা ও পূজা উদ্ভূত হয়। মহাযান-গ্রন্থ **সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্রেও** (পৃ. ২৫৫-২৫৭) ধ্যানীবুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। চীন জাপানে ইনি যথাক্রমে O-mi-to (ও-মি-তো) এবং Amida (অমিদ) নামে অভিহিত।

অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে (G.O.S. No, XL. p. 41) লিখিত বর্ণনানুযায়ী অমিতাভবুদ্ধ সূর্য-প্রভামণ্ডলের রক্তিম 'হ্রীকার' সম্ভূত। তাই এই ধ্যানীবুদ্ধ রক্তবর্ণের। ইনি পদ্মাসনে ধ্যানমুদ্রায় (অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ, পৃ. ৫) উপবিষ্ট থাকেন। ভ্রূজোড়ার মধ্যভাগে ঊর্ণা আছে। মস্তক উষ্ণীষ লক্ষণ যুক্ত। যুগ্ম-ময়ূর অমিতাভ বুদ্ধের বাহন। ইনি হাতে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করেন। ও পদ্মফুলী। অমিতাভ বুদ্ধের আধ্যাত্মিক শক্তি হলেন পাণ্ডরা। ইনি সংজ্ঞা-স্কন্ধের প্রতীক। স্তূপে এঁ'কে পশ্চিমদিকে স্থাপিত করা হয়।

অমিতাভের মূর্তি ও চিত্র ভারতসহ, চীন, তিব্বত, জাপান দেশসমূহে দেখা যায় তবে জাপান বা চীনে অমিতাভকে তাঁর শক্তিসহ দেখা যায় না। তিব্বতে ইনি শক্তিসহ Yab-yum ভঙ্গীতে পূজিত। সাধারণতঃ অমিতাভ দুই হাত বিশিষ্ট। এক হাতে বজ্র আর অপর হাতে ঘণ্টা ধারণ করেন। তাঁর শক্তি করোটি, কর্ত্তনী অথবা চক্র ধারণ করেন। কোন কোন অমিতাভ মূর্তির উষ্ণীষে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দৃষ্ট হন। দু-বাহু ছাড়া অধিকবাহু-বিশিষ্ট অমিতাভের মূর্তি দেখা যায়। তিব্বত ও চীনে অমিতাভ ধ্যানী বুদ্ধের বেশীর ভাগ

মূর্তি পাওয়া গেলেও বর্তমানে জাপানেই ইনি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন এবং জাপানে একটি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে অমিতাভের নামানুযায়ী Amidism নামে পরিচিত। অমিতাভবুদ্ধ অনন্ত প্রাণের প্রদাতা বলে 'অমিতায়ুস্' বোধিসত্ত্ব রূপে তিব্বতে অর্চিত।

সাধন সরকার

অমোঘবজ্র (১)

একজন অপ্রচলিত বোধিসত্ত্ব। তাঁর উৎপত্তি সম্পর্কে ভারতীয় বিশেষ কোনো প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র ইনি গর্ভধাতুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা যায়। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর চীনদেশীয় গ্রন্থ *Hsüan-fa-ssū-i-kuei*-তে তাঁর বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থটি '**মহাবৈরোচনসূত্রের**' টীকা।

চীনদেশীয় টীকাকারগণ অমোঘবজ্র বোধিসত্ত্বকে বজ্রধাতুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করে অক্ষোভ্য তথাগতের চারজন শিষ্যের মধ্যে একজন বলেছেন। জাপানেও এই মতবাদই প্রচলিত (দ্রষ্টব্য, *Tai-zōkai-shichishū*)। তিনি সর্বদা নিশ্চিতভাবে **শূন্যপ্রজ্ঞা**র দ্বারা জগতের সর্বপ্রকার পাপ ও মিথ্যা ধারণায় বিনাশ করেন বলে তার নাম অমোঘ বলে সার্থক। অমোঘ (অপরাজিত) বজ্র এর গুপ্ত নাম হল কর্মবজ্র বা *Pien-shih-chin-kang* এবং বীজমন্ত্র হল '**হুম্**', অথবা 'হূ' বা 'হূঃ'।

অমোঘবজ্র (২)—

বা অমোঘজ্ঞান (***chih-tsang***) প্রথম শতাব্দীর একজন **কিংবদন্তী** পুরুষ। চীনদেশীয় **কিংবদন্তী** অনুসারে তাঁর জন্মস্থান সিংহলদেশ বলে ধরা হলেও তিনি চীনদেশেই বৌদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক বলে বিশেষ খ্যাতি ও প্রচার লাভ করেন। তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষাগুরু যবদ্বীপের বজ্রবোধির সঙ্গে সঙ্গে চীনদেশে আসেন এবং কুড়ি বছর বয়সে সর্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং সংস্কৃত ও চীনা ভাষায় বিভিন্ন সূত্র ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন ও অনুবাদ কর্মে বজ্রবোধির সহায়ক হন। আবার তিনি সিংহলের রাজা অগ্গবোধি (৪র্থ)র সময় দেশে ফিরে এসে বুদ্ধের দন্তধাতুবিহারে সসম্মানে অবস্থান করে আচার্য সামন্তভদ্রর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তান্ত্রিক, লৌকিক, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা করেন এবং বৌদ্ধ হীনযান ও মহাযান পুস্তকের অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। তারপর চীনদেশে ফিরে 'অভিষেক' বা দীক্ষাগুরু হিসাবে স্বীকৃত লাভ করেন এবং বিস্তৃতভাবে সংস্কৃত গ্রন্থগুলির চীনা অনুবাদ করেন। এইভাবে তিনি যত মন্দিরে ও বিহারে গ্রন্থ পান সবগুলির অনুবাদক হন যদিও তাঁর অনুবাদের বিশাল ভাণ্ডার বৌদ্ধধর্মের ওপর অত্যাচারে মন্দিরবিহার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়। একসময় তিনি রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েন। তাঁর সত্তর বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটে এবং তাঁর শরীরধাতুর উপর স্মৃতিসৌধ স্থাপিত হয়।

তাঁর অনুবাদ সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। মহাযান সম্প্রদায়ের প্রচলিত তিনটি অঙ্গ যথা—**প্রজ্ঞাপারমিতা**, **অবতংসক** ও **মহাসন্নিপাত**-এর তিনি সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন যেমন, '**রাষ্ট্রপাল-প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র**' (Taishō 246, **দ্রুম-কিন্নর-রাজপরিপৃচ্ছাসূত্র**, **শ্রীমালাদেবীসিংহনাদসূত্র**, **ঘনব্যূহসূত্র** (ঐ ৬৮২); **গগনগঞ্জপরিপৃচ্ছাসূত্র** (ঐ ৪০৪), **মঞ্জুশ্রীবুদ্ধক্ষেত্রগুণব্যূহালঙ্কার সূত্র** (ঐ ৩১১), **মৈত্রেয়বোধিসত্ত্বভাষিত-**, **মহাযাননিদান-শালিস্তম্ভ-উপমান সূত্র** (ঐ ৭১০), **মহাযাননিদানশাস্ত্র** (ঐ ১৬৩০); **রাজ-**

ধর্মকায় সূত্র (ঐ ৫২৪), **মহাবৈপুল্য-তথাগত-গর্ভ-সূত্র** (ঐ ৬৬৭), **মহার্য-মঞ্জুশ্রীবোধিসত্ত্বগুহ্য-ধর্মকায়-প্রশংসা পূজা** (ঐ ১১৯৫) এবং **শতসহস্র-গাথা-মহাসন্নিপাতসূত্র-ক্ষিতিগর্ভবাদিসত্ত্বপরিপৃচ্ছা-ধর্মকায়স্তোত্র** (৪১৩)। উপরিল্লিখিত সূত্র ও শাস্ত্রগুলির অনুবাদ মূলতঃ নিদান, রাজধর্মনায়, তথাগতগর্ভ, ধর্মকায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তিশীল।

তাঁর অনুবাদ সাহিত্যের আর একটি ধারার মধ্যে অপ্রচলিত আধিভৌতিক ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ওপর রচনাগুলি দেখা যায়।

তাছাড়া তিনি বহু বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ করেন, যেমন—'বজ্রধাতুকল্প', যেটি তাঁর শিক্ষক বজ্রবোধির নিকট প্রধানতঃ শিক্ষার বিষয় ছিল সেইটি নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থ, **বজ্রশেখর-যোগশাস্ত্র**' (*Chin-kang-ting-shih pa-hui-chih-kuei, Taishō* ৮৬৯) এবং এর বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সম্বলিত বহু গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক সূত্র কল্প, বৌদ্ধদেবদেবীদের ওপর রচনার অনুবাদ, জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুবাদ পাওয়া যায়। তাঁর সমগ্র রচনাশৈলীর জন্য চীনদেশীয় লেখক Yuan-chao এর *Memorials of Amogha...collected with the Imperial Edicts He received* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য—*Encyclopaedia of Buddhism*-এ (১৯৬৪), K. Yu-র পাণ্ডিত্যোপেত প্রবন্ধ (পৃঃ ৪৮২-৪৮৭)।

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অমোঘসিদ্ধি

পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের অন্যতম হলেন **অমোঘসিদ্ধি**। ইনি অমোঘ-সফলতার দেবতা। বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন রূপে ইনি বর্ণিত হয়েছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে **অদ্বয়বজ্র-সংগ্রহ** গ্রন্থে (পৃ. ৪১) বিবৃত অমোঘসিদ্ধির রূপটি সর্বাপেক্ষা সুচারুরূপে বর্ণিত।

এই ধ্যানী বুদ্ধের রঙ সবুজ। এর পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন (symbol) হল বিশ্ববজ্র অথবা খল। বাম-হস্ত ক্রোড়ে স্থিত এবং দক্ষিণ-হস্তে অভয়মুদ্রায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট এবং সংস্কার-স্কন্ধভাবসম্পন্ন। ইনি বর্ষাঋতুর আধারক (embodiment) এবং স্বভাবে অম্ল সদৃশ। ইনি কর্মকুলী ও তিক্তরসের ধারক। এ'র শক্তি তারা। বিশ্বপাণি ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির মানসপুত্র।

অমোঘসিদ্ধির মূর্তি অথবা চিত্র বিশ্বের প্রায় সকল বৌদ্ধ দেশেই পাওয়া যায়। চীন দেশের কান্সু প্রদেশে আবিষ্কৃত অমোঘসিদ্ধির এক মূর্তিতে দক্ষিণ-হস্তটি অভয় মুদ্রায় বাম-হস্তটি বর-মুদ্রায় দেখা যায়। জাপানে অমোঘসিসিদ্ধি ধ্যানীবুদ্ধকে বুদ্ধ শাক্যমুনি রূপে অভিন্ন কল্পনা করা হয়। এই সব মূর্তিতে তাঁর দক্ষিণ-হস্ত অভয়মুদ্রার প্রকাশক। বাম-হস্তটি ক্রোড়ে স্থিত। তিব্বত ও চীনে অমোঘসিদ্ধি এক লোকপ্রিয় দেবতা।

সাধন সরকার

অম্বপালী—অপদান গ্রন্থে বলা হয়েছে অম্বপালী বৈশালীর আম্রবাগানে আম্রশাখান্তরে ওপপাতিকরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁর নাম হয়েছে অম্বপালী বা আম্রপালী। বাগান রক্ষক তাঁকে নগরে নিয়ে আসে। তিনি এতই সুন্দরী ছিলেন যে বহু রাজা-রাজপুত্র তাঁকে লাভ করার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়েন। অবশেষে নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য তাঁরা অম্বপালীকে নগর-শোভিকারূপে নিযুক্ত করেন। এ সময়ে তাঁর এক রাত্রির দক্ষিণা

ছিল ৫০ কহাপণ। অম্বপালীর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বিম্বিসার ছিলেন অন্যতম। তিনি অম্বপালীর পুত্র বিমলকোণ্ডঞ্ঞের জনক। অম্বপালীর জন্য বৈশালীর শ্রীবৃদ্ধি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বিম্বিসার রাজগৃহের জন্যও একজন নগরশোভিকা সংগ্রহে উৎসাহিত হন। শেষ জীবনে অম্বপালী বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করেন। বৈশালীর সন্নিকটে কোটিগ্রামে ভগবানের আগমন সংবাদ পেয়ে অম্বপালী তাঁর পরিচারিকাদলসহ রথারোহণে ভগবানের সঙ্গে দেখা করেন এবং বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানান। এই সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবিগণও ভগবানকে ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পিণ্ডপাত গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ভগবান লিচ্ছবীদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন (**সুমঙ্গলবিলাসিনী**, ২য়, পৃ.-৫৪৫)। পরদিন বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে ভোজন করিয়ে অম্বপালী তাঁর আরাম ও সমস্ত ঐশ্বর্য দান করেন। অম্বপালী তাঁর পুত্র প্রখ্যাত ভিক্ষু বিমলকোণ্ডঞ্ঞের ধর্মদেশনা শুনে সংসার ত্যাগ করেন। পরে বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজিতা হয়ে অচিরেই ষড়ভিজ্ঞাসম্পন্না হন। নিজের বয়োভারাক্রান্ত দেহে অনিত্যধর্মের লক্ষণ দর্শন করে তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। থেরী গাথায় তাঁর নামে ১১টি কবিত্বপূর্ণ গাথা স্থান পেয়েছে। গাথাগুলি তাঁর অন্তরের গভীর অনুভূতির প্রকাশ। প্রতিটি গাথার শেষ পংক্তি হল একটি ধ্রুবপদ (refrain)। গাথাসমূহের (২৫২-২৭০) ভাষা সাবলীল এবং উপমা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সমগ্র গাথাটি মনোজ্ঞ রথোদ্ধতা ছন্দে রচিত।

ভগবান ফুস্স সম্যক সম্বুদ্ধের সময় তিনি তাঁর ভগ্নী ছিলেন। এ সময় তিনি বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়ে রূপ সম্পদ প্রার্থনা করেছিলেন। এর পর ভগবান সিখী সম্যক সম্বুদ্ধের সময় তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সঙ্ঘে যোগদান করেন। শিক্ষানবীশ অবস্থায় তিনি ভিক্ষুণীদের একটি শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় শোভাযাত্রায় অগ্রগামিনী একজন বয়োজ্যেষ্ঠা, বিশুদ্ধচিত্তা ভিক্ষুণী পবিত্র স্থানে থুথু নিক্ষেপ করেন। কে থুথু নিক্ষেপ করেছে তা না জেনেই তিনি বলেন—কোন গণিকা এখানে থুথু ফেলেছে? এই বাচনিক পাপের জন্য মরণান্তিক ভয়ানক নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করে দশ সহস্র জন্ম গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেন। ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে মৃত্যুর পর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবপুরে উৎপন্ন হন। এখান থেকে চ্যুত হয়ে ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময়ে আম্র-শাখান্তরে জন্ম গ্রহণ করেন। পাপ ভোগ নিঃশেষ না হওয়ায় এবারও তাঁকে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু বহু সুকৃতির জন্য তিনি অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারিণী এবং সর্বগুণান্বিতা হন। **থেরগাথা** গ্রন্থেও দু'টি গাথা পাওয়া যায় যে গাথাদ্বয়ে আনন্দ অম্বপালী দর্শনে মোহগ্রস্ত ভিক্ষুদের তিরস্কার করেছেন। **মহাবগ্গ**, **মহাপরিনিব্বান সুত্ত**, **থেরীগাথা**, **অপদান**, **পরমত্থদীপনী** ও **মালালঙ্কারবত্থু** গ্রন্থে অম্বপালীর বিষয় পাওয়া যায়।

আশা দাশ

অম্বলট্ঠিকা—(সং আম্রযষ্টিকা)

এটি একটি রাজোদ্যানের নাম; রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী রাজপথের উপর অবস্থিত। উদ্যানের মধ্যে একটি রাজকীয় বিশ্রামাগার (রাজাগারিক) ছিল, যেখানে বুদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে অনেকদিন অতিবাহিত করেছেন। এই উদ্যানস্থিত রাজভবনেই বাস করবার সময় বুদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে ব্রহ্মজাল সূত্রটি দেশনা করেন। অন্তিমজীবনে পরিনির্বাণের পূর্বে আনন্দের সহিত বুদ্ধ কিছুদিন অম্বলট্ঠিকার রাজাগারে কাটিয়েছিলেন এবং এই স্থানেও তিনি ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ধর্মোপদেশে ব্যাপৃত হন। এই উদ্যানটি একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সূত্রের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট; **মজ্ঝিমনিকায়ের** ৬১-সংখ্যক পালি

সুত্তটির নাম হচ্ছে—'**অম্বলট্‌ঠিক-রাহুলোবাদ সুত্ত**'। এই বাগোদ্যানের নাম থেকে মনে হয়, একটি আম-বাগানকে পরিষ্কার করে প্রমোদ-কানন বা আরামে পরিণত করা হয়েছিল।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অরঞ্‌ঞবাসিনিকায় (আরণ্যবাসিনিকায়)

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে অরঞ্‌ঞবাসিনিকায়ের উল্লেখ রয়েছে। এই নিকায়ের ভিক্ষুগণ নির্জন বনে বাস করতেন। তাঁরা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন (**হি,বি, ১৯৭**)। মহাবংসে মহাবিহারের আরণ্যক ভিক্ষুর বর্ণনায় বলেছে, "মহাবিহারে ভিকখূনং বনে নিবাসতম্‌ অদা" (**ম, ব, ৬২, ২২**)। ষষ্ঠ শতাব্দী হতে বনবাসী ভিক্ষুদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে তাঁদের তপস্বী "সন্ন্যাসী", "যোগী" বলা হয়েছে (**ঐ, ৪১৯৯**)। দশম শতাব্দীর ধর্মীয় ইতিহাসে অনুরাধপুরের নিকটে "তপস্বী (যোগী) কুঞ্জবন" নামক বিহারের বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইহা আরণ্যবাসী ভিক্ষুদের বাসস্থান ছিল। পরবর্তীকালে আরণ্যক ভিক্ষুগণ জ্ঞান বিষয়ক কার্যকলাপে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা ধর্ম বিষয় ছাড়াও অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন। আরণ্যবাসী দিম্বুলাগল মহাকাস্যপ বালাভবোধন নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। এই সময়ে আরণ্যবাসী এবং গ্রামবাসী ভিক্ষুগণের মধ্যে কেবলমাত্র নামে তফাৎ ছিল, কিন্তু কার্যকলাপে নহে। এই দুটি সম্প্রদায় পরবর্তীকালে পরিচিত ছিল উভয়-বাস "দুই বাসস্থান", যাহা গ্রাম এবং অরণ্য (বন) (**নি, স, ২০-২৪**)। এখন সিংহলের কাণ্ডিতে অবস্থিত মলবত্ত এবং অসগিরিয় হচ্ছে প্রাচীন উভয়-বাসের বংসধর অর্থাৎ মলবত্ত হচ্ছে গ্রামবাস এবং অসগিরিয় হচ্ছে অরণ্যবাস (**হি, বি, ১৯৭**)।

সপ্তম খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গ রাজা সিংহলের আরণ্যবাসী নিকায়ে যোগ দিয়েছিলেন। এই নিকায়ের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ছিলেন আনন্দ বনরত্নতিস্স, বিদেহ, চোল বুদ্ধপ্রিয়, চুল্ল ধর্মপাল, বেধংকর মহাস্বামী, তাঁর শিষ্য আনন্দ এবং সিদ্ধার্থ। সিংহলের দম্বদেনিয়র দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু (১২৬৬ খৃষ্টাব্দ) অরণ্যবাসী নিকায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (**পা, সি, ২১০-২১১**)।

কানাইলাল হাজরা

অরিমদ্দন

উত্তর ব্রহ্মদেশের অরিমদ্দন নগরে রাজা পিনবা ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। অনুরুদ্ধ ১০৪৪ খৃষ্টাব্দে অরিমদ্দনপুরের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ব্রহ্মের সুধর্মনগর হতে সর্বজ্ঞের ধাতু, ত্রিপিটক গ্রন্থরাজি ও শীলবান ভিক্ষু অরিমদ্দনপুরে নিয়ে এসে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ত্রিরত্নের পরিপূর্ণতার জন্য অরিমদ্দন পুন্নগাম (পূর্ণগ্রাম) নামে পরিচিত হয়েছিল। পরে ইহা পুগাং বা পাগানে পরিণত হয় (**স, ব, ১০**)। অনিরুদ্ধের রাজত্বকালে এই নগর থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র হয়েছিল। কেন্ জিথ, অলং সিথু, নরপতি সিথু, চম্বা প্রভৃতি রাজগণ এখানে রাজত্ব করেছিলেন।

সম্রাট কুবলয় খান ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে অরিমদ্দনপুর (পাগান) অধিকার করেন। এর পতনের পর ব্রহ্মদেশ কয়েকটি ক্ষুদ্ররাজ্যে ভাগ হয়ে যায় (**স, ব, ।৵**)।

কানাইলাল হাজরা

অরিয়পরিয়েসনসুত্ত (আর্যপর্যেষণ সূত্র)—ইহা পালি **মজ্ঝিমনিকায়ের (মধ্যমনিকায়)** অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। কারণ এই সূত্রে বুদ্ধের আত্মজীবনী এবং বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সূত্রের শেষাংশে পাশবদ্ধ মৃগের উপমা থাকাতে অর্থকথায় (ভাষ্য) একে **'পাসরাসিসুত্ত'** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সূত্রটি গতানুগতিক "আমি এরূপ শুনেছি" এই বাক্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ একসময় শ্রাবস্তী সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থানকালে পূর্বাহ্নে ভিক্ষাচর্যা ও ভোজনান্তে পূর্বারামে মৃগারমাতৃ প্রাসাদে (বিশাখানির্মিত) দিবাবিহার সমাপন পূর্বক অপরাহ্নে আনন্দের অনুরোধে রম্মক ব্রাহ্মণের আশ্রমে গমন করেন এবং সমবেত ভিক্ষুদের পর্যেষণ (সন্ধান) সম্পর্কে ধর্মদেশনা করেন। তিনি বলেন যে পত্নীপুত্র-দাসদাসী-অজমেষ-জাতরূপরজত প্রভৃতি জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ-শোক-সংক্লেশানুগ ধর্মে গ্রথিত ও মূর্চ্ছিত হয়ে ঐ জাতীয় ধর্মের অন্বেষণই অনার্যোচিত পর্যেষণ। আর ঐ জাতীয় ধর্মে আদীনব (দুঃখময় পরিণতি) আছে জেনে অজাত-অজর-নির্ব্যাধি-অমৃত-অশোক-অসংক্লিষ্ট অনুত্তরযোগক্ষেম নির্বাণ সন্ধান করাই আর্যোচিত পর্যেষণ। উদাহরণস্বরূপ তিনি নিজ জীবনচরিত বর্ণনা করে বলেন যে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় তিনি অনার্যোচিত পর্যেষণে আদীনব আছে জেনে আর্যোচিত পর্যেষণের মনস্থ করেন। তিনি নবীন বয়সে স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদিয়ে মস্তকমুণ্ডনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রথমে **অরাড় কালাম** ও পরে **রুদ্রক রামপুত্রের** নিকট গিয়ে যথাক্রমে তাঁদের সাধনালব্ধ আকিঞ্চন আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন নামক অরূপ ধ্যানস্তর সাক্ষাৎ করে—নির্বাণ লাভের অনুপযোগী বিবেচনায় মগধের উরুবেলায় (বর্তমান বুদ্ধগয়া) গমন করে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন এবং অচিরেই নির্বাণ উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই যে গভীর, দুর্দর্শ, দুরনুবোধ্য, তর্কাতীত, পণ্ডিতবেদনীয় ধর্ম, হেতুপ্রত্যয়তা (কার্যকারণভাব) প্রতীত্য সমুৎপাদ এবং সর্বসংস্কারশমথ, তৃষ্ণাক্ষয় নিরোধ ও নির্বাণ, যা' কাম ও ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণের পক্ষে দর্শন করা দুষ্কর, তা' বুঝে তিনি ধর্মপ্রচারে নিরুৎসাহ বোধ করেন, কিন্তু **সহম্পতি** ব্রহ্মার অনুরোধে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়ে উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করেন। ইতিমধ্যে অরাড়কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের মৃত্যু হওয়াতে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট ধর্মদেশনার মানসে বারাণসী সমীপে ঋষিপত্তন মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) উপনীত হয়ে বলেন যে তিনি এখন তথাগত, অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ও অমৃতত্বের অধিকারী এবং তা'র উপদেশানুসারে আর্যোচিত পর্যেষণ করে তাঁরা যেন জ্ঞানদর্শন ও চিত্তবিমুক্তি এবং পরমশান্তি নির্বাণ লাভ করে পুনর্জন্ম নিরোধ করেন। অতঃপর তিনি পঞ্চকামগুণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র (কর্ণ) বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস ও কায়(ত্বক) বিজ্ঞেয় স্পর্শ—যা' ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামযুক্ত ও মনোরঞ্জক তা'ই পঞ্চকামগুণ। যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই পঞ্চকামগুণে আদীনবদর্শী না হয়ে কাম পরিভোগে মগ্ন হয়, তা'রা জাল পাশে আবদ্ধ শায়িত মৃগের ন্যায় পাপাত্মা মারের ইচ্ছাধীনও অনয়ব্যসনাপন্ন হয়ে বিনষ্ট হয়। আর যে ভিক্ষু কাম সম্পর্ক থেকে বিবিক্ত হয়ে সর্ব অকুশল পরিহার করেন তিনি ক্রমে ক্রমে চারটি ধ্যানস্তর, দুই সমাপত্তি এবং অবশেষে নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নামক লোকোত্তর সমাধি লাভ করে জ্ঞান দর্শনের ফলে আসবমুক্ত হয়ে অর্হত্ব লাভ করেন। (Ref. **মধ্যমনিকায় ১ম**, by বেণীমাধব বড়ুয়া)।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অরিয়পুগ্‌গল—

অরিয়পুগ্‌গল বলতে মহৎ ব্যক্তিকে বোঝায়। এই ব্যক্তিগণ পবিত্র আটটি স্তর অতিক্রম করেছেন। চারটি হল পথ এবং চারটি এই পথের ফল।

অর্হত্ত্ব স্তরে উপনীত হতে গেলে চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব। যাঁরা সৎ জীবন যাপন ক'রে, সমস্ত কিছু থেকে বিরত হয়ে নিজেকে জয় করেছেন তাঁরা স্রোতাপন্ন স্তরে উপনীত হতে পেরেছেন। এটি হল প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তর হল সকৃদাগামী। সকৃদাগামীরা এই সংসারে একবার প্রত্যাবর্তন করবেন এবং যাঁরা অনাগামী তাঁরা আর এই সংসারে আসবেন না এটি হল তৃতীয় স্তর এবং চতুর্থ স্তর হল অর্হৎ। পালি সাহিত্যে প্রত্যেক স্তরের দুটো করে ভাগ আছে। এভাবে আমরা চারটি স্তরের আটটি ভাগ পাই—

(১) সোতাপত্তি মগ্‌গে (২) সোতাপত্তি ফল (৩) সকদাগামী মগ্‌গ (৪) সকদাগামী ফল (৫) অনাগামী মগ্‌গে (৬) অনাগামী ফল (৭) অরহত্ত মগ্‌গে (৮) অরহত্ত ফল সোতাপত্তি মগ্‌গে সংকায় **দৃষ্টি**, বিচিকিৎসা এবং শীলব্রত-পরামর্শ অতিক্রম করে সকদাগামী মগ্‌গে উপনীত হয়। এখানে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ থেকে মুক্তিলাভ করে তৃতীয় স্তর অনাগামী স্তরে উপনীত হয়। এখান হতে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে হয় না। চতুর্থ বা শেষ স্তরের নামই অরহত্ত।

বেলা ভট্টাচার্য

অরিয়বংস—বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থটি সিংহলে লিখিত। উৎসবের দিনে বিহারে অরিয়বংস পাঠ একদা সিংহলে বিশেষ প্রচলিত ছিল। রাজা বোহারক তিস্সের সময়ে বিহারে **অরিয়বংস** পাঠের পর তিনি পিণ্ডপাত দ্বারা ভিক্ষুদের আপ্যায়িত করতেন। (**মহাবংস**, অধ্যায় ৩৬, পৃঃ ৩৮)

এই সুত্তটি সম্ভবতঃ **অঙ্গুত্তরনিকায়ে** (অ-২-২৭) উল্লিখিত চারটি অরিয়বংস গ্রন্থের প্রতি সংকেত দান করে।

অরিয়বংস সুত্ত—

'অরিয়বংস সুত্ত' নামে বুদ্ধঘোষিত একটি সুত্তের টীকায় (**দীঘ অট্‌ঠকথা**, ১ম পৃঃ ৫০ ; **মজ্‌ঝিম অট্‌ঠকথা** ১ম, পৃঃ ১৪) উল্লেখিত হয়েছে যে এই সুত্তটি বুদ্ধের নিজের ইচ্ছায় 'অত্তজ্‌ঝাসায়' প্রদত্ত সুত্তের উদাহরণ।

অরিয়বংস পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক এবং শিক্ষাগুরু। তিনি পাগানের অধিবাসী এবং চপট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ ভিক্ষু যে-দিন (Ye-din) এর শিষ্য ছিলেন (Bode, Pali Literature of Burma, p. 41f)। অরিয়বংস অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাসহকারে তাঁর গুরুর কাছে **অভিধম্মত্থবিভাবনী** শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গ্রন্থের উপর 'মণিসারমঞ্জুসা' নামে একটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হল—অত্থসালিনীর টীকা 'মণিদীপা', 'গন্ধাভরণ' নামক একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং 'জাতক-বিসোধন' নামে জাতক বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ। তিনি অভিধর্মের অনুটীকা রচনা করেন (**সাসনবংস**, পৃঃ ৪১ হতে)। **গন্ধবংসে** (পৃঃ ৬৪-৬৫), 'মহানিস্সর' নামে তাঁর আর একটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় ; যদিও সাসনবংসে এই গ্রন্থের উল্লেখ নেই।

অরিয়বংস তাঁর জীবনের কিছুকাল সগং (Sagaing)-এ অতিবাহিত করেন। পরে অব (Ava)-এ শিক্ষা লাভ করেন। এখানে রাজা তাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

আশা দাশ

অরূপ-লোক—ত্রিলোক বা ত্রিজগতের মধ্যে সর্বোচ্চ দেবলোক। ইহার নীচে হচ্ছে রূপলোক এবং কামলোক। অরূপলোকে কোন রূপই নেই অর্থাৎ রূপী কোন সত্ত্ব নেই। সমাধির দ্বারা অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে এই স্তরে উপনীত হওয়া যায়। অরূপলোকের চারিটি স্তর আছে।

১। **আকাশানন্তায়তন** যেখানে যোগীর চিত্ত আকাশের সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ২। **বিজ্ঞানানন্তায়তন** অর্থাৎ যেখানে অনন্ত আকাশও মনোজাত ছাড়া কিছু নয় বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব মনঃ বা বিজ্ঞানও অনন্ত। ৩। **অকিঞ্চনায়তন** অর্থাৎ যেখানে অনন্ত আকাশ এবং অনন্ত বিজ্ঞানও শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়। ৪। **নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন** অর্থাৎ যেখানে বিজ্ঞানপ্রবাহ বা মনন-প্রবাহ এত সূক্ষ্ম এবং এত প্রশান্ত হয় যে, গভীর সমাধিতে মগ্নাবস্থায় চিন্তন-মননের বিষয়ই অদৃশ্য হয়ে যায়।

উপরি উক্ত চারি অরূপধ্যানের চর্চার দ্বারা সত্ত্বগণ এই অরূপলোকে উৎপন্ন হয়। এই অরূপলোক ব্রহ্মলোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। তবুও ইহা অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম—এই তিনের অধীন। কারণ অরূপলোকে অবস্থিতি অস্থায়ী। অরূপলোক থেকে চ্যুত হলে পুনরায় এই কামলোকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অনিত্য বলেই দুঃখজনক। অতএব অরূপলোকেও শাশ্বত সুখ নেই। তবে সুখ কোথায়? বিপস্সনার দ্বারা অনিত্যতাবোধ, দুঃখবোধ, অনাত্মবোধ জাগ্রত হলেই জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ক্লেশভার আস্তে আস্তে লঘু হবে এবং শেষে তার একেবারে শূন্য হয়ে পরম শান্তিময় **নির্বাণসুখ** উপলব্ধ হবে।

সুকোমল চৌধুরী

অরূপাবচর—তুলনীয়ঃ **অরূপ-লোক**। 'লোক' বলতে বোঝায় স্থান বা ধ্যানভূমি অর্থাৎ অরূপ-লোক বলতে অরূপী দেবগণের 'লোক' বা জগৎ বুঝতে হবে। আর অবচর বলতে বোঝায় 'কর্মক্ষেত্র'। অতএব অরূপাবচরের কর্ম বলতে অরূপ ধ্যান সমূহকেই বোঝাচ্ছে যেগুলোর বিষয় হচ্ছে আকাশ, বিজ্ঞান, শূন্যতাদি অরূপ বিষয়। অরূপাবচর চার প্রকার। যথা—আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, অকিঞ্চনায়তন এবং নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন। দ্রষ্টব্যঃ **অরূপ-লোক**।

সুকোমল চৌধুরী।

অর্থপদ সূত্র—মধ্য এশিয়ার Khadlik-এ সংস্কৃত ভাষায় *Arthavargiya* নামে একটা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। অধ্যাপক A. F. R. Hoernle এই পাণ্ডুলিপিটির সঙ্গে পালি *Atthakavagga* এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। (দ্রষ্টব্য—Sir Aurel Stein, *Ruins of Desert Cathay*, vol. I, pp. 236-7; A.F.R. Hoernle, *J.R.A.S.*, 1916, pp. 709 ff; 1917 p. 134.) চীনাভাষায় *I-tsu-Ching* এর (Nanjio-No. 674; Taishō, vol. IV, No. 198) যে ১৬টি সূত্রের সংকলন আছে তার সঙ্গে পালি **সুত্তনিপাতের** অট্ঠকবর্গের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই ১৬টি সূত্র মনে হয় ভারতীয় প্রাকৃত-ভাষার কোন একটা লিখিত গ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ। [দ্রষ্টব্য, P. V. Bapat, *Arthapada-Sūtra*, Vishvabharati Mémoire, Santiniketan, Introduction, p. 13, 19, para 12].

অর্থপদ সূত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (পালি ও চীনানুবাদ অনুসারে) একজন ভ্রাম্যমান আড়ম্বরহীন সন্ন্যাসীর সাধারণ জীবন। এই সন্ন্যাসী কিভাবে পার্থিব জীবন, বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যুকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং নিজেকে পার্থিব বস্তু বা যৌন আনন্দ থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন তার বর্ণনা দেখা যায়। এই সন্ন্যাসী লাভ বা ক্ষতি, যশঃ বা অপমান, প্রশংসা বা নিন্দা, আনন্দ বা বেদনা এই আটটি লোকধর্মকে গ্রাহ্য করেন না। পবিত্রতা যে একজনের দেখা, শোনা, বোঝা বা অনুভব করার উপর নির্ভর করে তা তিনি মনে করেন না। [*dittha*, *suta*, *muta*, *viññāta*, *Arthapada Sūtra*; p. 5-6]. মূল পালি—**অট্ঠক**—শব্দের অর্থ সংস্কৃত—**অষ্টক** বা **অর্থক**, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত পোষণ করেন না।

অর্থপদ সূত্রটিকে বৌদ্ধেরা বিনয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করেন। বইটি বিভিন্ন বৌদ্ধপন্থী-সম্প্রদায়ের নিকট মূল্যবান কারণ এতে সূত্র ও **অভিধর্মের** গ্রন্থে এই মূল সূত্রের অনেক অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। চীন দেশীয় অনুবাদে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভ্রম প্রমাদের বিষয় লক্ষ্য করা হয়।

চীনদেশীয় এই গ্রন্থে পরিচায়ক হিসাবে গদ্যে কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে কিন্তু পালি ভাষায় গ্রন্থে তা পাওয়া যায় না। আপেক্ষিক ভাবে গল্পগুলি পরবর্তী সংযোজন এবং সেখানে '**নির্মিত**' বুদ্ধের একটী নবীন ধারণার প্রবর্তন দেখতে পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য—M. Anesaki নিবন্ধ, *Le Muséon*, N.S. VII. 1906, 33 ff., পুনর্মুদ্রণ—*Katam Karaṇiyam*, pp. 284-304.

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অর্থবর্গীয় সূত্র—খদ্‌লিকে (মধ্য এশিয়া) আবিষ্কৃত বৌদ্ধ সংস্কৃতে বিরচিত পাণ্ডুলিপি গুলির অন্যতম। খোটানের বণিক বদরুদ্দিনের কাছ থেকে Sir Aurel Stein এই পাণ্ডুলিপিটি ক্রয় করেন। **অভিধর্মকোষ**-কারিকার (১.১৩) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **দিব্যাবদান** (পৃ. ৩৫) ও অভিধর্মকোষ-ব্যাখ্যাতে অর্থবর্গীয় সূত্রের নামোল্লেখ দেখা যায়। ঐ ব্যাখ্যাতে একটি পদ্যাংশের উল্লেখ আছে যা পালি **সুত্তনিপাতের** ৭৬৭ নং পদ্যাংশের অনুরূপ। অধ্যাপক A. F. R. Hoernlea [A. F. R. Hoernle, *JPTS*, 1916; p. 709ff; 1917, p. 134) মতে এর প্রথম খণ্ডটিতে পালি **তিস্‌সমেত্তেয় সুত্ত** (নং ৭), দ্বিতীয় খণ্ডে পালি **পসূর সুত্ত** (নং ৮), তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডটিতে পালি **মাগন্দিয় সুত্ত** (নং ৯) এর সাদৃশ্য বহন করে। Hoernle মনে করেন এই সূত্রের পঞ্চম খণ্ডটির সঙ্গে **পুরাভেদ-সুত্তের** গদ্যাংশের ভূমিকার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাঁর এই অভিমতে সন্দেহ আছে। **কলহবিবাদ সুত্তের** (নং ১১) গদ্যাংশের সঙ্গে এই সূত্রের মিল লক্ষ্য করা যায়, যে অংশ অর্থপদ সূত্রের (P. V. Bapat, *Arthapadasūtra*, Intro. p. 8) চীনানুবাদে **মাগন্দিয় সুত্তের** পরবর্তী।

এই পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যাংশের মাপ ৬ × ৩"; ডান ও বাম অংশ ভগ্ন। পালি ও চীনদেশীয় ঐ সূত্রের সঙ্গে তুলনা করার জন্য এই পাণ্ডুলিপিগুলি বিশেষ উপকারী নয়; কিন্তু এরা সংকেতিত করে যে পালি **অট্‌ঠকবগ্‌গ** ও চীনদেশীয় *I-tsu-ching* বা **অর্থপদসূত্রের** পর্যায়ক সংস্কৃত **অর্থবর্গীয়সূত্র** বর্তমান ছিল।

দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক P. V. Bapata এই সূত্রের সম্পর্কে *Encyclopaedia of Buddhism*, vol. II (Ceylon, 1966), পৃঃ ৯৯এ রচনা।

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অর্থবিনিশ্চয় সূত্র—**অর্থ বিনিশ্চয় সূত্র** বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। **অভিধর্ম-পিটকের** ন্যায় ধর্মের মূল শর্তগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। অর্থবিনিশ্চয় সূত্র ২৭টী অনুচ্ছেদে (১) পঞ্চ স্কন্ধ (২) পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ (৩) ১৮টিধাতু (৪) ১২টি আয়তন (৫) প্রতীত্যসমুৎপাদ ও তার ১২টি কারণ (৬) ৪টি আর্যসত্য (৭) ২২টি ইন্দ্রিয় (৮) ৪টি ধ্যান (৯) ৪টি অরূপ্য-সমাপত্তি (১০) ৪টি ব্রহ্মবিহার (১১) ৪টি প্রতিপদ (১২) ৪টি সমাধিভাবনা (১৩) ৪টি স্মৃত্যুপস্থান (১৪) ৪টি সম্যক-প্রধান (১৫) ৪টি ঋদ্ধিপাদ (১৬) পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (১৭) পঞ্চ-বল (১৮)সপ্তবোধ্যঙ্গ (১৯) আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ (২০) ষোড়শ অনাপানস্মৃতি (২১) ৪টি স্রোতাপত্ত্যঙ্গ (২২) দশ-তথাগতবল

(২৩) ৪টি বৈশারদ্য (২৪) ৪টি প্রতিসংবিদ (২৫) ১৮টি আবেণিক বুদ্ধধর্ম (২৬) ৩২টি মহাপুরুষলক্ষণ এবং (২৭) ৮০টি অনুব্যঞ্জন প্রভৃতি ধর্মীয় শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে। কালক্রমে বহু সংযোজন ঘটেছে, যেমন বলা যায় **নারায়ণ** মতবাদের প্রভাবে ৩২নং মহাপুরুষলক্ষণের সঙ্গে যোজিত হয়েছে—'মহানারায়ণশরীর সমন্তপ্রাসাদিকতা'।

অর্থবিনিশ্চয় সূত্রের দুটি চীনানুবাদ (*Nanjio*, Nos. 928 এবং 1015; *Taishō* Vol. XVII; Nos. 762, 763) এবং একটি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ পাওয়া যায়। (*OM*. No. 983; *T.M*. No. 317)। ধর্মপালের রাজত্বকালে নালন্দা বিহারনিবাসী ভিক্ষু বীর্যশ্রীদত্তকৃত এই সূত্রের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যার নকলনবিস হিসাবে বীর্যশ্রীমিত্রবীরের নামোল্লেখ আছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলি চীনার তিব্বতীয় অঞ্চলে সুরক্ষিত এবং রাহুল সংকৃত্যায়ন কর্তৃক গৃহীত এর আলোকচিত্র পাটনার কে. পি. জয়সওয়াল ইনস্টিটিউটে রক্ষিত আছে। এছাড়াও এর অনুলিপি কাঠমণ্ডুর রাজগ্রন্থাগার ও বরোদার ওরিয়্যান্টাল ইনস্টিটিউটে পাওয়া যায়।

এই সূত্রটি উদ্দেশ ও নির্দেশ এই দুইভাগে বিভক্ত। **ধর্মসংগ্রহ** ও **মহাব্যুৎপত্তির** ন্যায় এই সূত্রটিও ধর্মের বিভিন্ন শর্তগুলি সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা করায় এটি বৌদ্ধধর্মের সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **অর্থবিনিশ্চয় সূত্রটির** পুঁথির ও টীকার সময় যথাক্রমে সম্বৎ ৩১১, চৈত্র শুক্ল রাত্রি এবং সম্বৎ ৩১১ শ্রাবণ শুক্ল প্রথম ধরা হয়। নেপালীতে যে সম্বতের কথা বলা হয়েছে তা ১১৯১ এ.সি. অনুরূপ। **মহাব্যুৎপত্তি, সূত্র-সমুচ্চয়, অভিসময়ালংকার, অভিধর্মকোষব্যাখ্যা** প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিব্বতীয় অনুবাদে মহাপুরুষের তেত্রিশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু চীনানুবাদগুলিতে বত্রিশটি লক্ষণের উল্লেখ দেখা যায়।

অর্থবিনিশ্চয়সূত্রের সম্পর্কে যশোমিত্রের **অভিধর্মকোষের** (১.৪) ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তাতে ধর্মবিষয়ক আলোচনার জন্য একে অভিধর্ম-গ্রন্থ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (সূত্রবিশেষা এব হ্যর্থবিনিশ্চয়াদয়োঽভিধর্মসংজ্ঞাঃ যেষু ধর্মলক্ষণং বর্ণ্যতে)। এই গ্রন্থের গুরুত্ব বুঝতে পারা যায় এই জন্য যে হরিভদ্রের **অভিসময়ালঙ্কারালোকে; সূত্রসমুচ্চয়, বিমুক্তিমার্গ** প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা উল্লিখিত।

গ্রন্থের নাম বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যাবে যে এই গ্রন্থে অর্থ অর্থাৎ বিষয়ের (ধর্মবিষয়ক) বিশ্লেষণ করা হয়েছে (অর্থানাং বিনিশ্চয়ো ধর্মাণাং প্রবিচয় ইত্যর্থঃ। পৃঃ ৭৩; অর্থস্য বিবিধাকারেণ নিশ্চয়ো ভবত্যেতৎ শ্রবণাৎ সত্ত্বানামিত্যর্থ বিনিশ্চয় ইত্যনুগতার্থা সংজ্ঞা, পৃঃ ৮৩, Santani-কৃত সং)। [**অর্থবিনিশ্চয়-নাম-ধর্মপর্যায়** সংজ্ঞক একটি গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত ও তিব্বতীয়, চৈনিক ও মঙ্গোলীয় অনুবাদে রক্ষিত আছে। অনুবাদক হিসাবে নাম পাওয়া যায়—যেমন জিনমিত্র, প্রজ্ঞাবর্ম ও Ya-śes sde (*TM*. 317, 170b⁴-158a⁷]

এ বিষয়ে বিস্তৃততর তথ্যের জন্য আলোচ্য:

Alfonsa Ferrari, *Arthaviniścayasūtra*, a fragmentary printed text, *Reale Academia d' Italia*, Rome (1944); N.H. Samtani, The *Arthaviniścayasūtra and its commentary*; P. V. Bapat, A brief notice of the same text and its commentary, in Summaries of papers, XIXth session of the *All-India Oriental Conference*, Delhi, 1957; P.L. Vaidya, *Arthaviniścayasūtra*, text in *Buddhist Sanskrit Texts Series* (No. 17) from the Nepalese copy in Baroda.

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অর্হৎ—বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে নিরবশেষভাবে সংসার-দুঃখ থেকে মুক্তি যার বৌদ্ধ পারিভাষিক নাম অর্হত্ত্ব। যিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন তাঁকে বলা হয় অর্হৎ। ভগবান গৌতম বুদ্ধই সর্বপ্রথম অর্হৎ। অর্হত্ত্ব লাভ করেই তিনি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়েছিলেন। অর্হত্ত্ব লাভ করার পূর্বে পর পর আরও তিনটি অগ্রগমনশীল স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম স্তরটির নাম স্রোতাপত্তি (সোতাপত্তি)। সংকায়দৃষ্টি বা আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস, নাস্তিক্যপূর্ণ সংশয় এবং শীলব্রতাদিতে অনুরাগ—এই তিনটি বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারলে সাধক স্রোতাপত্তি লাভ করেন। আরও ঊর্ধ্বগামী হবার সঙ্কল্প নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন থেকে সাধক যদি কামরাগ এবং বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারেন তখন তাঁকে বলা হয় সকৃদাগামী (সকদাগামী)। সংকায়দৃষ্টি থেকে শুরু করে বিদ্বেষ এই পাঁচটি বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সাধক অনাগামিত্ব লাভ করেন। পরে ঊর্ধ্বভাগীয় আরও পাঁচটি বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে সাধক অর্হত্ত্ব লাভ করে সর্বদুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই পাঁচটি বন্ধন হচ্ছে—রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা। অর্হৎ সর্বপ্রকার ক্লেশ এবং আস্রব থেকে বিমুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন। অর্হতের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—অর্হৎ হবেন ক্ষীণাস্রব, ক্লেশবিমুক্ত, বশীভূত, সুবিমুক্তচিত্ত, সুবিমুক্তপ্রজ্ঞ, আজানেয়, মহানাগ, কৃতকৃত্য, কৃতকরণীয়, অপহৃতভার, অনুপ্রাপ্ত-স্বকার্থ, পরিক্ষীণ-ভবসংযোজন, সর্বচেতোবশিপ্রাপ্ত, পরম-পারমিতা-প্রাপ্ত। অর্হতের আরও চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা বা বৈশ্লেষিক জ্ঞান লাভ হয়, যথা, অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম—", নিরুক্তি—" এবং প্রতিভান—"।

বিমুক্তিভেদে অর্হৎ দুই প্রকারের—উভতোভাগবিমুক্ত অর্থাৎ যিনি চেতোবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি উভয়প্রকার বিমুক্তি লাভ করেছেন এবং প্রজ্ঞাবিমুক্ত অর্থাৎ যিনি কেবলমাত্র প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করেছেন। বুদ্ধ স্বয়ং উভতোভাগবিমুক্ত অর্হৎ। তবে প্রজ্ঞাবিমুক্ত অর্হৎকেও পরে চেতোবিমুক্তি লাভ করতে হয়। সেজন্য অর্হতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পালিতে বলা হয়েছে—'ইধ ভিক্খবে ভিক্খু আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞ্ঞাবিমুত্তিং দিট্ঠেব ধম্মে সয়ং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতি।' (অর্থাৎ ভিক্ষু সকল প্রকার আস্রব বা চিত্তক্লেশ ক্ষয় করে অভিজ্ঞার দ্বারা ইহজন্মেই স্বয়ং চেতোবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করেন।)

অর্হৎ শব্দ √অর্হ্ ধাতু (অর্থাৎ সমর্থ হওয়া) থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। নিজের চেষ্টার দ্বারা যোগবলে চিত্তের সমস্ত প্রকার কালুষ্য থেকে ক্রমশঃ নিজেকে মুক্ত করে পুনর্জন্মের বীজ ধ্বংস করতঃ পরম শান্তিময় অজর অমর নির্বাণসুখ উপলব্ধি করতে 'সমর্থ' বলেই অর্হৎ বলা হয়।

সুকোমল চৌধুরী

অল্লকপ্প—এটি মগধের সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইহারই কাছে ছিল বর্তমান (বিহারের চম্পারণ জিলার অন্তর্গত) বেতিয়া (Bettiah) অন্তর্লক্ষিত 'বেঠদীপ' নামক আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এ দুটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত কাল পরে অল্লকপ্পবাসী বুলিরা কুশীনারার মল্লদের কাছে দূত পাঠিয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী জানিয়ে ভগবান বুদ্ধের পূতাস্থি সংগ্রহ করেন এবং স্তূপ নির্মাণ করেন (মহাপরিনিব্বান সুত্ত)।

সুকুমার সেনগুপ্ত

অলগদ্দোপম সুত্ত (সূত্র)—

এই সূত্রটি আমরা **মজ্ঝিমনিকায়ে** পাই। একসময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় অরিট্ঠ নামে একজন ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছিল। তার মতে সে ভগবৎ-দেশিত ধর্ম এমনভাবে জানতো যে ভগবান যে সকল পাপধর্ম অন্তরায়কর মনে করেন সেসকল ধর্ম অনুশীলন করলে তার অন্তরায় ঘটাবে না। তখন সমস্ত ভিক্ষুগণ অরিট্ঠকে এই পাপদৃষ্টি থেকে মুক্ত করার জন্য অত্যন্ত বিনম্রী হয়ে বুঝিয়ে এরূপ উক্তি করতে নিষেধ করলেন। ভগবান বুদ্ধের অপবাদ করা কখনই ভাল নয়।

তখন ভিক্ষুগণ অরিট্ঠকে অনেক বোঝালেন, অরিট্ঠকে এইরকম পাপদৃষ্টি থেকে বিচ্যুত করতে না পেরে ভগবান বুদ্ধকে জানালেন, ভগবান বুদ্ধ অরিট্ঠকে ডেকে পাঠালেন এবং অনেক কথা বললেন। তিনি কামকে অস্থি-কঙ্কাল-সদৃশ, মাংসপেশী-সদৃশ, তৃণোল্কা-সদৃশ, অঙ্গার-সদৃশ, স্বপ্ন-সদৃশ, যাচিতক-সদৃশ, বিষবৃক্ষের ফলস্বরূপ, অসিধারা সদৃশ, শক্তিশূল সদৃশ সর্পশির সদৃশ বলেছেন। তাতেও পূর্বসূত্রবধক অরিট্ঠকে নীরব দেখে সমস্ত ভিক্ষুগণকে ডেকে অলগর্দ অর্থাৎ এক বিষধর-সর্পের উপমা দিলেন। অলগর্দ-অর্থী, অলগর্দ-গবেষক, জনৈক ব্যক্তি অলগর্দ-অন্বেষণে বিচরণ করতে করতে এক বৃহৎ অলগর্দ দেখতে পেল এবং এর দেহমধ্যে অথবা অঙ্গুষ্ঠ ধরলো, অলগর্দ উল্টে তার হস্তে দংশন করলো। হয়তো সে মৃত্যুমুখে পতিত হল অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পেল। এর কারণ হল যে সে অলগর্দের যথাস্থানে ধরতে পারেনি। সেইরূপ ভগবান বুদ্ধের ধর্ম অধ্যয়ন করে প্রজ্ঞাদ্বারা এর অর্থ উপপরীক্ষা করে না বলে সত্যটাও উপলব্ধি করতে পারে না। যারা তার ধর্ম প্রজ্ঞাদ্বারা উপপরীক্ষা করে তাদের পক্ষে নিধ্যান সম্ভব। এই সূত্রে অলগর্দের উপমা দিয়ে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বুঝিয়েছেন।

বেলা ভট্টাচার্য

অবতংসক সূত্র (*Hua-yen-ching*)

অবতংসক সূত্র (ফুলের মালা বা অলংকারস্বরূপ যে সূত্র) যা সংস্কৃতে যার পূর্ণ নাম হল—**'বুদ্ধাবতংসকমহাবৈপুল্যসূত্র'** বোধিদ্রুমের পাদদেশে বোধিলাভের পর ভগবান্ সামন্তভদ্র, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির মাধ্যমে বুদ্ধের নিকট প্রতিভাত হয়েছিল। এর মধ্যে ভগবান্ বুদ্ধ বিভিন্ন কর্ম এবং তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সূত্রটির বহু ভাষায় অনুবাদ পাওয়া যায়। চীনাভাষায় তিনটি অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে বুদ্ধভদ্র, শিক্ষানন্দ ও প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাকৃত অনুবাদের চীনদেশীয় ভাষায় নাম হল—*Ta-fang-kuang-fu-hua-yen-ching* (*Gaṇḍa-vyūha. Taishō*, No. 293)। প্রথম অনুবাদের মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি (৩৬,০০০ শ্লোকসম্বলিত) [দ্রষ্টব্য : *the postscripts to the Collection of the Records of the Translations of the Tripiṭaka-Ch'u-san-tsang-chi*, fasc IX]। শিক্ষানন্দকৃত অনুবাদের মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি ছিল ৪৫,০০০ শ্লোক-সম্বলিত (চীনদেশে সর্বাধিক প্রচলিত অনুবাদ) [দ্রষ্টব্য : *Catalogue of Buddhist Sacred Books of the Ka'i-yüan Period-Ka'i-yüan-shih-chiao-lu*, fasc. IX], এবং তৃতীয় অনুবাদের মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি ১৬৭০০ শ্লোকে ছিল। [দ্রষ্টব্য : *the Catalogue of Buddhist Sacred Books of the Chēn-yüan Period* ; Chēn-yüan-shih-chiao-lu, fasc. 17]। তা ছাড়া চীনাভাষায় এই সূত্রটির অংশবিশেষের অনুবাদও পাওয়া

যায়। [দ্রষ্টব্য : Fa-sang-এর *The Records on Hua-yen-ching—Hua-yen-ching-chuan-chi*, Fas. 1.]।

এই সূত্রটির তিব্বতী *'Sans-rgyas-phal-po-che shes-bya-ba śin-tu-rgyas-pa chen-pohi mdo'*-এর অনুবাদক হিসাবে ভারতীয় লেখক জিনমিত্র ও সুরেন্দ্রবোধি এবং তিব্বতী লেখক Ye-śés-sde-এর একত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অনুবাদটি ১১৫টি গুচ্ছে এবং পঁয়তাল্লিশটি বিভাগে বিভক্ত।

চীনা ও তিব্বতী ছাড়া এই সূত্রটির কোরিয়ান ও জাপানী আলোচনাও পাওয়া যায় এবং সূত্রটিকে ভিত্তি করে উক্ত দেশসমূহে বহু গ্রন্থ রচিত হয়।

এ বিষয়ে তথ্যোপেত বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—*Encyclopaedia of Buddhism*, vol. II, Fas. 3 : পৃ. ৪৩৫-৪৪৬, K. kuর প্রবন্ধ।

হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

অবদানশতক

বৌদ্ধসংস্কৃত (Buddhist Sanskrit) ভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থনিচয়ের মধ্যে **অবদান-শতকম্** সম্ভবতঃ অবদান সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও শিক্ষা তথাগত শুদ্ধ শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধের প্রথম প্রচারের সময়কালীন বলে অনুমিত। গ্রন্থটি একশত অবদান অর্থাৎ বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের কুশল ও অকুশল কর্মাবলীর ফলাফল বর্ণনামূলক উজ্জীবনী কাহিনীর সংকলন। গ্রন্থটি চীনা ভাষায় (Nanjio. 1324) খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে Wu রাজবংশের রাজত্বকালে Chih Ch'ien কর্তৃক অনূদিত হয়। সম্ভবতঃ চীনা ভাষায় অনূদিত হওয়ায় অন্ততঃ পঞ্চাশ বা ষাট বছর আগেই গ্রন্থটি সংকলিত রূপে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে; কারণ কোন গ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ ও পরে অনূদিত হওয়ার জন্য এ সময়টুকু একান্ত আবশ্যক। এছাড়া গ্রন্থটির তিরাশি সংখ্যক কাহিনী 'হিরণ্যপাণি অবদানে রোমীয় মুদ্রা 'দীনার' (লক্ষশাহতং দীনারবর্ষম্) শব্দটির উল্লেখ থাকায় খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের মধ্যে গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছিল বলা চলে। চীনা ত্রিপিটক শাস্ত্রে **অবদানশতকটি** Chuan-chi-pai-yüan-ching অর্থাৎ **শতাবদানসূত্র** নামে অভিহিত। তিব্বতী ভাষায় এই গ্রন্থটির অনুবাদ **'ভাঞ্জুরে'** লিখিত আছে। পরবর্তীকালে ফরাসী ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয় (L. Feer, *Annales du Musée Guimet*)। গ্রন্থটির শেষাংশের (colophon) গ্রন্থ-পরিচয়ে জানা যায় যে নন্দীশ্বর আচার্য ছিলেন গ্রন্থের সংকলক। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে তিনি কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রন্থটি স্মৃতিভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করে লোকসমাজে পরিবেশন করেছিলেন মাত্র।

অবদানশতক গ্রন্থটি দশটি বর্গে বিভক্ত। প্রতিটি বর্গই আবার দশটি করে অবদান কাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি বর্গের অবদানগুলি এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে লিপিবদ্ধ। প্রথম ও তৃতীয় বর্গের অবদান কাহিনীগুলি বুদ্ধ ও প্রত্যেকবুদ্ধগণের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী বিষয়ক। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্গের কাহিনীগুলি বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনী সমূহকে কেন্দ্র করে রচিত। পালি জাতকের মত প্রত্যুৎপন্নবস্তু, অতীতবস্তু ও সমাধান এই তিনটি অংশের সমন্বয়ে অবদানগুলি রচিত। পঞ্চম অধ্যায়টি পালি **পেতবত্থু**-র মত বিভিন্ন প্রেতলোকবাসীদের কর্মফলের কথায় পূর্ণ। প্রেতলোকের কষ্টকর জীবন-যাপনের প্রতিচ্ছবিগুলি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অবদানগুলিতে বিবৃত। কুশলকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় হয় তার ফলেই যে প্রেতলোকের ফলভোগের অবসান সম্ভব সে কথাই দৃষ্টান্ত সহকারে

বর্ণিত। অনুরূপভাবে ষষ্ঠবর্গের অবদান-কাহিনীগুলি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ যে বুদ্ধগণের প্রতি কুশলকর্মানুষ্ঠানের ফলের দ্বারা সম্ভব স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছে। পালি **বিমানবত্থু**-র সঙ্গে স্বর্গ-বর্ণনায় এ বর্গের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। অষ্টমবর্গের কাহিনীবিশিষ্ট বিশিষ্ট বৌদ্ধ নারী চরিত্রের অবদানসমূহ নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে সপ্তমবর্গ থেকে দশমবর্গের অবদানগুলির গল্পের মূল চরিত্রের অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিবিষয়ক। সপ্তমবর্গের চরিত্রগুলি সবই শাক্যকুলের। দশমবর্গের পূর্বজন্মের অকুশল কর্ম-ফলাফলের কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বুদ্ধগণের অন্তিমজীবনে বিষম ফলগুলির কথা বিবৃত হয়েছে গল্পের সাহায্যে। শততম অবদানটি অন্যান্য অবদান থেকে স্বতন্ত্র এবং অশোক, মহাকাশ্যপ, উপগুপ্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহের ঘটনাপঞ্জীতে সমৃদ্ধ। তাই বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে শততম অবদানটি গুরুত্বপূর্ণ।

অবদানশতক গ্রন্থটির রচনাশৈলী লক্ষণীয়। বুদ্ধের বর্ণনা, রাজার বর্ণনা, সমৃদ্ধ রাজ্যের বর্ণনা, অর্হত্ত্বের গুণ-বর্ণনা, নরক বর্ণনা প্রভৃতিতে প্রতিটি গল্পই একই ধরণের বাক্যরীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে কাহিনীগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্যবোধ পৌনঃপুনিকতায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে রচিত গাথাগুলি কিছুটা কাব্যসৌন্দর্যের সৃষ্টি করলেও গ্রন্থটিকে সাহিত্যসৌন্দর্যে হৃদয়গ্রাহী করা সম্ভব হয়নি। এই অবদানে ব্যবহৃত প্রমাদবহুল সংস্কৃতভাষা বৌদ্ধসংস্কৃত নামে অভিহিত।

অবদানশতক গ্রন্থটিকে থেরবাদীয় রচনা বলে ধরা হয়, কেহ কেহ **অবদানশতক**কে সর্বাস্তিবাদের গ্রন্থ বলে মনে করেন। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব পূজা এবং মহাযানীয় অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনীগুলির অনুপস্থিতি, বোধিসত্ত্ব-তত্ত্বের অনুল্লেখ নিশ্চিতভাবে গ্রন্থটিকে থেরবাদীয় পর্যায়ভুক্ত করে। এই অবদানের অনেক কাহিনীই পরবর্তী যুগের **দিব্যাবদান** বা **কর্মশতক**, **অশোকাবদানমালা** প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়বস্তুরূপে বিবেচিত হয়েছে। অতএব পরবর্তী যুগের অনেক অবদান কাহিনীর উৎস ছিল **অবদানশতক** গ্রন্থ।

সাধন সরকার

অবলোকিতেশ্বর

বৌদ্ধ মহাযানী দেবতামণ্ডলের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর অন্যতম জনপ্রিয় বোধিসত্ত্ব। আবির্ভূত অমিতাভ ধ্যানী বুদ্ধ ও তাঁর শক্তি পাণ্ডরা থেকে এঁ'র সৃষ্টি। অবলোকিতেশ্বর ভদ্রকল্পে হন। শাক্যমুনি বুদ্ধের নির্বাণ, লাভের সময় এবং অনাগত-কালের মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব কালের মধ্যে এঁ'র স্থিতি।

'অবলোকিত'ও 'ঈশ্বর' এই দুইটি শব্দে সমাসবদ্ধ অবলোকিতেশ্বর পদটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 'যে ঈশ্বর সর্বত্র দৃষ্ট হন', 'আমাদের দৃষ্টি-গ্রাহ্য-বস্তুর ঈশ্বর', 'যে ঈশ্বর অবলোকন করেন', 'যে ঈশ্বর উচ্চস্থান থেকে নিম্ন-লোক অবলোকন করে', করুণাদৃষ্টিসম্পন্ন ঈশ্বর' প্রভৃতি অবলোকিতেশ্বর শব্দটির ব্যাখ্যাগম্য অর্থ।

মহাযানী গ্রন্থ **'কারণ্ডব্যূহ'**-তে (পৃঃ ৩০৩) এই বোধিসত্ত্বের প্রকৃতি, স্বভাব ও শিক্ষা প্রভৃতি বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে। তিনি করুণার প্রতিমূর্তি। প্রাণিকুলের জন্য করুণা-বশতঃ করুণাসমাধি থেকে উত্থিত হয়ে সকল অবলোকন করেন (মহাকরুণা সমাপত্তিতো বুট্‌ঠায় লোকং বোলোকেত্তো, ধম্মপদত্থকথা ১, ৩৬৭)। **গুণকারণ্ডব্যূহের** বর্ণনানুযায়ী (পৃঃ ৩০৬-৭) তিনি জীবকুলের প্রতি অপার করুণাবশতঃ নির্বাণ গ্রহণে অস্বীকৃত হন এবং সমস্ত জীবের বোধিজ্ঞান লাভের কাল পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকে। **কারণ্ডব্যূহের** বিবরণ (পৃঃ ২০৮) অবলোকিতেশ্বর সকল ধর্মের সকল প্রকার দেবতার রূপ ধারণ করতে

সক্ষম এবং সকল ধর্মের সকল পূজককেই তিনি জ্ঞানধর্ম বিতরণ করেন তাঁর জ্ঞানলোকে প্রথম মানুষ এবং পরে পশু ও অন্যান্য প্রাণী আধ্যাত্মিক সাধনার অগ্রসর হয়ে মুক্ত হয়। এসব কারণে তিনি শ্রেষ্ঠ সংঘরত্ন নামে অভিহিত। অবলোকিত বোধিসত্ত্ব ধারণা থেকেই পরবর্তীকালে অবলোকিতেশ্বর দেবতা রূপে পর্যবসিত হন।

অতএব অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব পরবর্তীকালে তাঁর মানবিক গুণধর্ম হারিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবতায় পরিণত হন এবং তান্ত্রিক শিক্ষা ও ধর্মের প্রভাবে ভিন্ন প্রকৃতিতেতে পর্যবসিত হন। তাঁর চারিত্রিক গুণ-ধর্ম-সমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ফলে পরিপূর্ণ দেবত্ব ও দেবতার রূপ লাভ করে। তাই অবলোকিতেশ্বরের রূপ-কল্পনায় বিভিন্ন মন্ত্র, বর্ণ, চিহ্ন, অস্ত্র, বাহন, শক্তি আরোপিত হয়। প্রায় ১০৮ প্রকারের অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি বা চিত্র দেখা যায়। যদি এদের মধ্যে পনেরটি রূপ বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি গুপ্তযুগের সূচনা থেকেই পাওয়া যায়। '**সুখাবতীব্যূহে**' অমিতাভস্য আভা অমিতা চ অমিতং চ আয়ুরমিতশ্চ সংঘঃ (**সুখাবতীব্যূহ**, পৃঃ ৫১) এ'র প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধদেবী, তারা-ই অবলোকিতেশ্বরের প্রধান শক্তি। প্রধানতঃ ইনি শ্বেতবর্ণের হলেও নেপালে রক্তবর্ণের রূপেই পূজিত হন। এর বীজমন্ত্র—'ওঁম্ মণি পদ্মে হুম্'।

ভারতবর্ষে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের পূজা ও আবির্ভাবকালের প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ করা যায় নি। মহাযান-গ্রন্থ **সুবর্ণপ্রভাস-সূত্রে** অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের রাজত্বকালে মহাসাংঘিক ধ্যানধারণায় অবলোকিতেশ্বর কল্পিত হন। কিন্তু বোধিসত্ত্বের পূর্ণ সত্তা নিয়ে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করে। অবলোকিতেশ্বরের কল্পনা ও চিন্তা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বহির্ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশে এই বোধিসত্ত্বের পূজা প্রচলিত হয় এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমনকি থেরবাদী সিংহল (শ্রীলঙ্কা) দেশেও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর জনপ্রিয় দেবতা রূপে পূজিত হন। চীন দেশে ইনি **Kuan-Shin-Yin** নামে পরিচিত। সেখানে সূচনায় পুরুষ দেবতা ও ভুলক্রমে দ্বিতীয় পর্যায়ে নারী-দেবতা রূপে কল্পিত হন। দেবীরূপে ছাড়াও অবলোকিতেশ্বরের জন্য অবলোকিতেশ্বর 'পদ্মপাণি' রূপে সংজ্ঞিত।

জাপানে অবলোকিতেশ্বর **Kwan Non** রূপে পরিচিত এবং **Suiko** রাণীর রাজত্বকালে সেখানে প্রথম পূজা শুরু হয়। মোট তেত্রিশটি রূপে তিনি জাপানে পূজিত। তিব্বতে-ও অবলোকিতেশ্বর অতি জনপ্রিয় দেবতা এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে এই বোধিসত্ত্বের পূজা আরম্ভ হয়। তিব্বতে তাঁর রূপ কল্পনার বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্ট নয় এবং তান্ত্রিক রূপ-কল্পনাতেই ইনি এখানে অর্চিত। এ'র ষড়ক্ষরী মন্ত্রই তিব্বতে ধর্মীয় জীবনকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। চম্পা (**Kambodia**)-তে ও অবলোকিতেশ্বরের কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গেছে।

অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি সাধারণতঃ পর্বতশীর্ষে স্থাপিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থ **অবতংসক সূত্রে** অবলোকিতেশ্বর পোটল পর্বতবাসী রূপে বর্ণিত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্ 'পোটল' পর্বতটি দক্ষিণভারতে অবস্থিত বলে লিখেছেন। আবার দালাইলামার রাজপ্রাসাদ 'পোটল' হওয়ায় অবলোকিত বোধিসত্ত্বের সঠিক অবস্থান তর্কের বিষয়ে রূপান্তরিত। পঞ্চানন বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের প্রাপ্ত রূপটি হিন্দু-দেবতা শিবের সঙ্গে তুলনীয়। কখনো কখনো তিনি শক্তিসহ আলিঙ্গনাবদ্ধাবস্থায় শিব-পার্বতীর রূপকল্পনার সাদৃশ্য বহন করেন।

অবলোকিতেশ্বরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মূর্তিগুলির শীর্ষভাগস্থ চূড়ায় তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা অমিতাভের মূর্তি বিরাজমান। অবশ্য চিত্রিত মূর্তিতে অমিতাভের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়

না। দণ্ডায়মান চিত্রগুলি বর-মুদ্রার প্রকাশক। প্রস্তরের মূর্তিগুলিতে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট এই দুটী ভঙ্গীই রয়েছে। এসব মূর্তির মুদ্রা হল—বরদ, প্রার্থনা, ব্রহ্মাঞ্জলি প্রভৃতি। শিবকল্প মূর্তিতে তিনি সর্প ও ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান থাকেন। জাপানে প্রাপ্ত একটি মূর্তির বাহুতে সর্পবেষ্টনের অলঙ্করণ দৃষ্ট। **সাধনমালা**-য় অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের প্রধান প্রধান মূর্তিগুলি হল—ষড়ক্ষরি-লোকেশ্বর, সিংহনাদ, খসর্পণ, লোকনাথ, হলাহল, পদ্মনর্তেশ্বর, নীলকণ্ঠ, সুগতিদর্শন, প্রেতসন্তর্পিত, সুখাবতী লোকেশ্বর ও বজ্রধর্ম। উপরের উল্লিখিত বোধিসত্ত্বের পরিকল্পনায় যে হিন্দুধর্মের দেব-দেবতার স্পষ্টতই প্রভাব আছে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অবলোকিতেশ্বর তাই হিন্দু ও বৌদ্ধাদর্শের সম্মিলিত রূপ।

সাধন সরকার

অবিগতপচ্চয় (অবিগত প্রত্যয়)—ইহা **পট্‌ঠান** গ্রন্থে উল্লিখিত চতুর্বিংশতিতম প্রত্যয়। প্রকৃতপক্ষে অবিগত প্রত্যয় (relation of non-disappearance as causal factor) অস্তিপ্রত্যয় সদৃশ। তিনক্ষণে বিদ্যমান থেকে ইহা প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মকে পোষণ করে। বুদ্ধঘোষের মতে শুধু দেশনাবিলাসে ভগবান (বুদ্ধ) এর উল্লেখ করেছেন। (অত্থিপচ্চয়ধম্মাএব চ অবিগত ভাবেন উপকারকত্তা অবিগতপচ্চয়ো তি বেদিতব্বা। দেসনা-বিলাসেন পন তথা বিনেতব্ব—বেনেয্যবসেন বা অয়ং দুকো বুত্তো, বিসুদ্ধিমগ্‌গ, পৃঃ ৫৪১)।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

অবিজ্জা

অবিজ্জা শব্দের অর্থ অজ্ঞতা। ইহা দ্বারা জগতের মানুষের এবং তার অদৃষ্ট সংক্রান্ত বাস্তব প্রকৃতির প্রত্যক্ষ এবং বস্তুগত জ্ঞানের অভাবকে বোঝায়। প্রাচীন ব্যাখ্যানুযায়ী চতুরার্য সত্য অর্থাৎ বিষয়ের অসন্তোষজনক অবস্থার কারণ, অসন্তোষজনক অবস্থার নিবৃত্তি এবং এই অসন্তোষজনক অবস্থার নিবৃত্তির পথ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই অবিজ্জা (**স. নি.** ২, ৪ ; ৪, ২৫৬ ; ৫, ৪০৯)। **ধম্মসঙ্গণি** গ্রন্থে ইহার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "চতুরার্য সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, কারণসূচিত শর্তাধীন ঘটনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা—এইরূপ অজ্ঞতাই অবিজ্জা, অন্তর্দৃষ্টির অভাব, বোধশক্তির, জ্ঞানের, সত্য প্রতিপাদনের অভাব, অজ্ঞান, বুদ্ধিহীন, হতবুদ্ধিভাব, অজ্ঞতা, অজ্ঞতার প্রাচুর্য, অজ্ঞতার আবেগ ইত্যাদি—ইহাকে বলা হয়—মোহ (**ধ. স.** ১০৬১)। ...ইহাকেই অজ্ঞতার প্রতিবন্ধক—বলা হয় (ঐ, ১১১২)। বারবার জন্মগ্রহণের মধ্যে এই অজ্ঞতার বাধা রয়েছে (**স. নি.** ১, ২৯৪)।

চৈনিক আগমে অবিজ্জার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "ইহা হচ্ছে অতীতের, ভবিষ্যতের, উভয় অতীতের ভবিষ্যতের, উভয় অতীতের এবং ভবিষ্যতের, ভিতরের, বাহিরের, উভয় ভিতরের এবং বাহিরের কাজের ফলাফলের, উভয় কাজের এবং ফলাফলের বুদ্ধের, ধম্মের, সঙ্ঘের, অসন্তোষজনক অবস্থার, এর উৎপত্তির, এর নিবৃত্তির এবং এর পথের অজ্ঞতা। ইহা হচ্ছে কারণের, কারণজনিত শর্তাধীন অবস্থার, ভালর এবং মন্দর, লব্ধনের এবং অলব্ধের, উপযোগীর এবং অনুপযোগীর, নিকৃষ্টতরের এবং উৎকৃষ্টতরের অপবিত্রের এবং পবিত্রের অজ্ঞতা। ইহা হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শের ছয় আয়তন সম্পর্কে যথার্থ বুদ্ধির অভাব, প্রকৃত বিষয়ের অজ্ঞতা, জ্ঞানের এবং এইরূপ এবং এইরূপ বিষয়ের উপলব্ধির অভাব এবং প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। ইহা হচ্ছে মোহ এবং সুস্পষ্টতার অভাব, এই বিরাট অজ্ঞানতার অন্ধকার হচ্ছে অজ্ঞতা......" (**তাকাকুসু**, ২, ৮৫)।

অজ্ঞতার (অবিদ্যার) সহিত ইচ্ছাশক্তিপূর্ণ কাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। অজ্ঞতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তিপূর্ণ কাজের অবসান ঘটে (স, নি, (২, ৯)। অজ্ঞতার (অবিদ্যার) ফলে আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় অথবা অপরের প্ররোচনায় সম্পূর্ণ অবগত না হয়ে আমরা দেহের, বাক্যের অথবা মনের ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ কাজগুলি সম্পাদন করি (স, নি, ২, ৪০)।

কানাইলাল হাজরা

অবিজ্ঞপ্তি

ইহা সর্বাস্তিবাদীদের একটি মনস্তাত্ত্বিক কল্পনা। শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্পষ্টভাবে অপ্রকাশিত', 'অনভিব্যক্ত' 'অপ্রতীয়মান' 'অন্তর্নিহিত'।

পাঁচটি স্কন্ধ নিয়ে সত্ত্ব, যেমন—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞা—", সংস্কার—" এবং বিজ্ঞান—"। সর্বাস্তিবাদীরা রূপস্কন্ধকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—১। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ২। পঞ্চ বিষয় এবং ৩। অবিজ্ঞপ্তি। অবিজ্ঞপ্তি আবার রূপ এবং কর্মভেদে দ্বিবিধ—অবিজ্ঞপ্তি রূপ এবং অবিজ্ঞপ্তি কর্ম। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, অবিজ্ঞপ্তি রূপও নয়, কর্মও নয়। দৃশ্য এবং শ্রাব্য বস্তুর ন্যায় অবিজ্ঞপ্তি কেবল রূপ নয়, কারণ এর মধ্যে কোন না কোন কর্ম নিহিত আছে। আবার অবিজ্ঞপ্তি কেবল কর্মও নয়, কারণ ইহা বাস্তব উপাদানের দ্বারা সৃষ্ট। অবিজ্ঞপ্তির এই দ্বিবিধ স্বরূপের জন্য অবিজ্ঞপ্তি-রূপ এবং অবিজ্ঞপ্তি কর্ম উভয়ই সাধারণভাবে 'অবিজ্ঞপ্তি কর্ম' বা শুধু 'অবিজ্ঞপ্তি'রূপে ব্যবহৃত হয়। কর্ম দ্বিবিধ—কায়িক এবং বাচিক। আবার—বিজ্ঞপ্তি-অবিজ্ঞপ্তি ভেদে কায়িক এবং বাচিক কর্ম চতুর্বিধ, যেমন কায়িক-বিজ্ঞপ্তি কর্ম, কায়িক অবিজ্ঞপ্তি কর্ম, বাচিক বিজ্ঞপ্তি কর্ম এবং বাচিক অবিজ্ঞপ্তি কর্ম। সর্বাস্তিবাদীদের বক্তব্য হ'ল এই যে, যখনই কেউ কোন একটি কাজ করে বা ভাব ব্যক্ত করে, তখনই অন্তর্নিহিত সুপ্ত একটি শক্তি কর্তা বা বক্তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহার নাম **অবিজ্ঞপ্তি**।

আচার্য বসুবন্ধু তাঁর অভিধর্মকোশে (১/১১) অবিজ্ঞপ্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

'বিক্ষিপ্তাচিত্তকস্যাপি যোঽনুবন্ধঃ শুভাশুভঃ।
মহাভূতান্যুপাদায় স হ্যবিজ্ঞপ্তিরুচ্যতে ॥'

অর্থাৎ অবিজ্ঞপ্তি হচ্ছে সেই কর্মসন্ততি যা কুশল হোক বা অকুশল হোক, বিক্ষিপ্তচিত্ত বা অচিত্তক ব্যক্তির মনেও বিদ্যমান থাকে এবং যার উৎপত্তি পৃথিবী, অপ্, তেজঃ এবং বায়ু এই চারি মহাভূতের উপর নির্ভরশীল। অবিজ্ঞপ্তি কর্ম এবং অবিজ্ঞপ্তিরূপ সমার্থক। কারণ কর্ম রূপেরই অন্তর্গত। সঙ্ঘভদ্র বলেছেন যে বসুবন্ধু-প্রদত্ত অবিজ্ঞপ্তির সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ। তাই তিনি অবিজ্ঞপ্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

'কৃতেঽপি বিসভাগেঽপি চিত্তে চিত্তাত্যয়ে চ যৎ
ব্যাকৃতাপ্রতিঘং রূপং সা হ্যবিজ্ঞপ্তিরিষ্যতে।'

[সময়প্রদীপিকা]

অর্থাৎ অবিজ্ঞপ্তি হচ্ছে অপ্রতিঘরূপ।

পরবর্তীকালে বসুবন্ধু তাই তাঁর পূর্বপ্রদত্ত সংজ্ঞাকে সংশোধন করে বলেছেন—'অবিজ্ঞপ্তি-সমাধিসম্ভূতং রূপম্ অনিদর্শনম্ অপ্রতিঘম্'। (দ্রঃ পঞ্চস্কন্ধক)। অর্থাৎ অবিজ্ঞপ্তি কেবল অপ্রতিঘরূপ নয়, অনিদর্শন রূপও বটে। বসুবন্ধু তিনপ্রকার অবিজ্ঞপ্তির কথা বলেছেন—সংবর, অসংবর এবং নৈবসংবরনাসংবর। (অভিধর্মকোশ, ৪/১৩)। স্থিরমতি তাঁর

পঞ্চস্কন্ধকের টীকাতে আরও একটি অবিজ্ঞপ্তিকর্ম সংযুক্ত করেছেন। সেটা হচ্ছে—'বোধিসত্ত্ব-সংবর'।

বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি শাখা 'অবিজ্ঞপ্তি'র ধারণাকে গ্রহণ করেছেন নানাভাবে। হরিবর্মা তাঁর 'সত্যসিদ্ধিশাস্ত্রে' বলেছেন—অবিজ্ঞপ্তি এমন একটি ধর্ম যা চিত্তজও নয় আবার চিত্তবিপ্রযুক্তও নয়। ধর্মলক্ষণশাখা অবিজ্ঞপ্তিকে সম্পূর্ণ চিত্তজ বলেছেন। সৌত্রান্তিকগণ 'অবিজ্ঞপ্তি'র ধারণাকে গ্রহণই করেননি।

সুকোমল চৌধুরী

দ্রষ্টব্য—১। **অভিধর্মকোশ**, ১/১১

২। Sukomal Chaudhuri, Analytical Study of the Abhidharmaokośa, p. 76.

গ্রন্থসংকেত

G.O.S.—Gaekewad's Oriental Series (Baroda)
JBRAS—Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society
JPTS—Journal of the Pali Text Society (London)
PPN (ডি. পা) = Dictionary of Pali Proper Names by G.P. Malalasekera
PTS—Pali Text Society (London)
Vin—Vinaya piṭaka
অ, কো,—অভিধর্মকোশ
ওয়াটার্স—On Yuan Chwang by Watters
ক, ব,—কথাবত্থু
চু, ব—চুলবংস
জিমার—The Art of Indian Asia by Zimmer
থে, বু, = Theravāda Buddhism in Burma by N. R. Ray
দত্ত—Early Monastic Buddhism by N. Dutt
দা, ব,—দাঠাবংস
দী, নি—দীর্ঘনিকায়
ধ, স,—ধম্মসঙ্গণি
নি, স—নিকায়সংগ্রহ—Ed. D. P. R. Samaranayake
নি, প,—A Concise History of Ceylon by Ādikaram
প, সি—Pali Literature of Ceylon by G. P. Malalasekera.
প, সু, = পপঞ্চসূদনী (পি. টি. এস)
বিনয়—বিনয়পিটক
ভা, ই,—Bharhut Inscriptions by B. M. Barua
মজ্ঝিম-অট্‌ঠকথা—মজ্ঝিমনিকায়-অট্‌ঠকথা
ম, ব,—Mahāvaṁsa (মহাবংস)
ম, সে,—Encyclopaedia of Buddhism, Ed. G. P. Malalasekera
শ, ব,—শাসনবংশ—পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির
স, নি—সংযুত্তনিকায়
স, পা,—সমন্তপাসাদিকা
স, ব,—সাসনবংস
সু, বি,—সুমঙ্গলবিলাসিনী
সেইফনের—Eine Tibbetische Beschreibung Śākyamunis in Ayusoge unit
Getheilot, F. A. von Seifoner.
হি, বি,—History of Buddhism in Ceylon by W. Rahula

গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে বিস্তৃতভাবে গ্রন্থপরিচয় ও গ্রন্থসংকেত সন্নিবেশিত হইবে বলিয়া এই স্থানে কয়েকটী মাত্র দিগ্‌দর্শনের জন্য দেওয়া হইল।